পল্লীবোধনে অন্নসমস্যা

পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য্য
শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য

পল্লীবোধনে অন্নসমস্যা

পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য্য

শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য

সাহায্য—দেড় টাকা

প্রকাশক :—
শ্রীনগেন্দ্র নাথ দত্ত, বি, কম্ ;
প্রকাশক :—সমাধি গ্রন্থাবলী,
ও
সম্পাদক—"সমাধিমঠ,"—পশ্চিম বঙ্গ,
৫০, ভৈরব দত্ত লেন,
পোঃ—সালিখা,
হাওড়া।

প্রথম সংস্করণ, দুই হাজার
৫ই কার্ত্তিক, ১৮৭১ (১৩৫৬)

—পুস্তক প্রাপ্তিস্থান—

সম্পাদক, আর্যসংঘ

(১) পোঃ— সমাধিনগর, জেঃ—ফরিদপুর
(২) " — কাশিমপুর, " —রাজসাহী
(৩) **'সমাধি আশ্রম'**, পোঃ—রাজবাড়ী, জেঃ—ফরিদপুর
(৪) ৫০, ভৈরব দত্ত লেন, পোঃ—সালিখা, জেঃ—হাওড়া
(৫) ১২৬, সদর বক্সী লেন, পঞ্চানন তলা,
পোঃ হাওড়া, জেঃ—হাওড়া

—মুদ্রাকর—
শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায়
শ্রীকালী প্রেস
৬৫, ৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

গ্রন্থকারের কথা

'পল্লীবোধন' প্রথম জন্মলাভ করে প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে ডাঃ শ্রীসুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি) সভাপতিত্বে পোয়ালন্দ পল্লীমঙ্গল সমিতির যে অধিবেশন বালিয়াকান্দিতে (ফরিদপুরে) হয়, তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ দেই তাহাতে। বহু লোকের আগ্রহ সত্বেও উহা এতদিন মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিতে পারি নাই নানাকারণে যদিও উহা বর্ধিত কলেবরে মুদ্রিত হইবার জন্য পাণ্ডুলিপিরূপে প্রস্তুত হইয়া ছিল। সন্ন্যাস লইয়া স্বাধন স্বাধ্যায়াদিতে বেশীর ভাগ মন নিযুক্ত থাকায় উহা বহুদিন অবহেলিত হইয়াই ছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে উহার প্রকাশিত হইবার প্রয়োজন খুব বেশী বোধ করায় উহা প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছি।

'পল্লীবোধনে'র একটী অধ্যায় বর্ধিত কলেবরে 'জাতিকথা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার দুই সংস্করণ কয়েকবৎসরের মধ্যেই শেষ হইয়া যাওয়ায় তাহার তৃতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে। 'পল্লীবোধনে'র আর দুইটী প্রস্তাব (অধ্যায়) বর্ধিত কলেবরে এবং আর একটী নব অধ্যায় সহিত যুক্ত হইয়া সম্প্রতি প্রকাশিত হইল 'পল্লীবোধনে অন্নসমস্যা' নামে।

এই পঁচিশ বৎসরে ভারতের ও বাংলার উপর দিয়া বহু রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। তাহার আধুনিকতম তথ্যাদি দিয়া 'পল্লীবোধনে অন্নসমস্যা'কে সর্ব বিষয়ে আধুনিকতম করিতে না পারিলেও, মূল সমস্যা সমূহ এবং তাহার সমাধানের দিক

দিয়া ইহাকে নানাভাবে অধুনিকতম যুগোপযোগী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বৃটিশ ভারত শাসনের আমলে পল্লীর অন্নসমস্যায় যে সব বিষয় চিন্তনীয়, অনুধাবনীয় এবং যে সমস্যাসমূহ দূরীকরণীয় ছিল, আজও তাহা সেইরূপেই রহিয়াছে। হিন্দুস্থান ভারত রাষ্ট্রে এবং পাকিস্তান মুশ্লীম-রাষ্ট্রে ভারতের, পাঞ্জাবের এবং বাংলার অঙ্গচ্ছেদ হইলেও সে সব সমস্যা তো পূরণ হয়ই নাই, অধিকন্তু তাহারা আরও জটিল হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ:—

(১) বৃটিশের ভারত শাসনের 'কাঠামে'র পরিবর্তন অতীব সামান্যই হইয়াছে। বৃটিশ সরকারের পরিবর্তে কংগ্রেস সরকার ও মুশ্লীমলীগ সরকার যে রাষ্ট্র পরিচালনা ও অর্থনীতি নির্ধারণ করিতেছেন তাহাতে উপরে উপরে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হইলেও নিখিল ভারতের সাত লক্ষ পল্লীর পল্লীবোধন আদৌ হয় নাই। পল্লীবোধনে অন্নসমস্যা পূর্ববৎ কেবল মাত্র প্রবল থাকে নাই, তাহা অধিকতর জটিল ও ব্যাপক হইয়াছে। পল্লীবোধনে অন্নসমস্যায় এই রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক কাঠামটার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন ব্যতিরেকে পল্লীসমস্যা পূরণ হইবে না। 'পল্লীবোধনে অন্নসমস্যা'য় সমস্যাগুলি কি ভাবে যে মারাত্মকরূপে চলিয়া আসিতেছে তাহা বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির অভিমত উদ্ধৃত করিয়া পরিস্কৃতভাবে দেখাইয়াছি। সমস্যা পূরণের তাঁহাদের নির্দেশিত পথগুলি পচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বেও যাহা ছিল, আজিও তাহাই আছে অধিকতর জটিলতা ও ব্যাপকতার আকারে। সেই সব নির্দেশিত পথগুলির সহিত আমার নির্দেশিত পথগুলি দেখাইয়া 'পল্লীবোধনে অন্নসমস্যা' প্রকাশিত করিলাম পল্লীবোধনে, কোটী কোটী হিন্দুস্থানী পাকিস্তানী পল্লীবাসীর কল্যাণে। এইজন্য অকপটে সত্য সন্ধানের জন্য আমাকে অনেক কঠিন সমালোচনা এবং ভ্রান্ত রাষ্ট্রনীতি খণ্ডন করিতে হইয়াছে। পল্লীবোধনে বৃটিশ কাঠামের প্রধান দোষ এই যে সে সমালোচনার

সত্য আলোকপাত সহ্য করিতে পারে নাই, যথার্থ সত্য নির্ণয়ে তাহার আন্তরিক প্রবৃত্তি নাই। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান রাষ্ট্রকর্ত্তারা কতখানি সমালোচনার সত্য আলোক সহিষ্ণু এবং কতখানি যথার্থ সত্য নির্ণয়ে আন্তরিক প্রবৃত্তি যুক্ত তাহার পরিচয় অদূর ভবিষ্যতে সম্মুখেতেই পাওয়া যাইবে। পশুশক্তি বলে সমালোচনার গঠন মূলক প্রস্তাবের মুখবন্ধ, কণ্ঠরোধ করিতে থাকিলে তাহাতে বৃটিশ রাষ্ট্রনীতির কাঠামের দেশী কংগ্রেস ও মুশ্লীমলীগ সংস্করণ মাত্র হইবে। তাহাতে মুল অন্নসমস্যার সমাধান হইবে না।

(২) পল্লীবোধনে অন্নসমস্যার যে অর্থনৈতিক দিক আছে তাহার সমস্যাও পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে যাহা ছিল, তাহার পরিবর্তন, উন্নতির দিকে ত হয়ই নাই, অধিকন্তু তাহা অধঃপতনের মুখেই গিয়াছে। অর্থলোভী, মোটা মাহিয়ানার উচ্চপদস্থ কর্মচারী-বৃন্দ যদি নিজের ও পরিবার বর্গের ভোগ সাধনেই অধিকতর ব্যাপৃত থাকেন এবং তাহার জন্য প্রয়োজন হইলে জন-সাধারণের সর্বনাশ করিয়াও নিজের নিজের উদর পূর্তির দিকে লোলুপ দৃষ্টি রাখেন, তবে তাঁহাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতেই বাধ্য। যে রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতির পশ্চাতে আছে দলীয় উপদলীয় অর্থলাভ, পদলোভ, প্রভুত্ব প্রয়াস, তাঁহাদের গালভরা লম্বা লম্বা অর্থনৈতিক বুলি বা 'শ্লোগান' (Slogan) এর ভণ্ডামি আর কপটতা কোন দিনই পল্লীবোধনে অন্নসমস্যায় অর্থনীতির সমাধান করিতে পারিবে না 'পল্লীবোধনে অন্নসমস্যায়' আমি তাহা দেখাইয়াছি। সে সমস্যা পঁচিশ বৎসর পূর্বেও যাহা ছিল আজিও তাহাই আছে।

(৩) অন্নসমস্যার তৃতীয় প্রধান কারণ শীলনৈতিক, চরিত্র-নৈতিক; রাষ্ট্র পরিচালক বর্গের অধিকাংশই যদি সুশীলবান, চরিত্রপরায়ণ, অর্থলোভত্যাগী, মানব হিতৈষী এবং যথার্থ রাষ্ট্র কল্যাণকামী না হন, তবে তাঁহাদের দ্বারা কোনো সমস্যাই পূরণ

হইবে না। তাঁহারা যেটুকু কল্যাণ পল্লীর বা পল্লীবাসীর করিবেন তাহা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি এবং প্রভুত্ব ও পদরক্ষার জন্যই করিবেন। এই রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি সমস্যা দুই বিশ্বযুদ্ধের পরে অত্যধিক প্রবল ও ব্যাপক যে হইয়াছে রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বক্ষেত্রে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিদূরিত করার রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, পারিবারিক ও যথার্থ ধর্মীয় সাধনার ভিতরেই অন্নসমস্যা পূরণের রক্ষা কবচ, জীবন বীজ রক্ষিত আছে। 'পল্লীবোধনে অন্নসমস্যা'য় আমি তাহা দেখাইয়াছি। হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের প্রভুশক্তির তাহা হৃদয়ঙ্গম করা ততদিনে হইবে না, যতদিনে প্রজাশক্তি, পল্লীবাসীর সংহতি, সুসংগঠিত শক্তি এই সমস্ত সমস্যা পূরণে তাঁহাদের প্রতিনিধিদের উপর চাপ দিতে না থাকিবেন এবং দুর্নীতি পরায়ণ, অযোগ্য ব্যক্তিদিগকে অপসারিত করিবার জন্য কর্মক্ষেত্রে উদ্যোগী না হইবেন। এইসব অসৎ, দুর্নীতিপরায়ণ কর্তাদের তাড়াইতে গেলে দল উপদল টিকিবে না, রাষ্ট্র টিকিবে না বলিয়া কর্তারা মিথ্যা ধূয়া তো তুলিবেনই এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধ আন্দোলনকারীদের বেআইনীভাবে আইনের দোহাই দিয়া মুখবন্ধ, কণ্ঠরুদ্ধ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতে থাকিবেনই। সেই ভয়ে ভীত, আতঙ্ক গ্রস্ত হইলে রাষ্ট্রীয় সংস্কার, অর্থনৈতিক ও শীলনৈতিক সংস্কার এবং কোন সংস্কারই পল্লীবাসীর কল্যাণে সম্ভব আদৌ হইবে না। হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র দুইটিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই সমস্ত পল্লীসমস্যা পল্লীবোধনে পূরণ করিতেই হইবে।

'পল্লীবোধন' নামক অপর পুস্তকে আমরা পল্লীসমস্যার অন্যান্য বিষয় সমুহ আলোচনা করিয়াছি জনসাধারণের যথার্থ কল্যাণে। তাহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে আশা করিতেছি।

সুধী ও মহানুভব সজ্জনসমাজ 'জাতিকথা'দির ন্যায় ইহারও যদি সম্বর্ধনা এবং আদর করেন তবে আমার শ্রম সার্থক হইবে এবং

পল্লীবাসী আমার অন্তরের এক মহাঅভিলাষ পূর্ণ হইবে। গঠনকামী সমালোচকদের সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী দোষ ক্রটী থাকিলে তাহা সংশোধনের চেষ্টায় অবহিত থাকিব।

নিবেদক—

গ্রন্থকার **শ্রীসমাধিপ্রকাশ আরণ্য**
প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, আর্যসঙ্ঘ
৫০, ভৈরব দত্ত লেন, পোঃ সালিখা, হাওড়া

সম্পাদকের নিবেদন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয়ে আমরা এতদিন "সমাধি প্রকাশ" গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করিতে পারি নাই বহুলোকের উহা পাইবার অগ্রহ থাকা স্বত্বেও। আমরা পুনরায় আমাদের গুরুভাই ভগিনী-দিগের এবং স্বামীজীর ভক্ত অনুরক্তগণের উৎসাহে ও সাহায্যে ক্রমশ আরও গ্রন্থ নূতন ভাবে এবং বর্ধিত নূতন সংস্করণে ছাপাইয়া প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিলাম। তাহার মধ্যে "ব্রহ্মচক্র" "হিন্দুসংগঠনে" ও "পল্লীবোধনে অন্নসমস্যা" তিনখানি বই প্রকাশিত হইল। "সমাধি প্রকাশ" গ্রন্থাবলী প্রকাশে যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন দানশীলতায় তাঁহাদের নাম ও সাহায্যের পরিমাণ নিম্নে দিলাম। আশা করি অন্যান্য যাঁহারা এই মহৎ ও লোককল্যাণকর কাজে সাহায্য করিতে চাহিয়াছেন ও চাহিবেন, তাঁহারা উহা সত্বর দান করিয়া "সমাধিপ্রকাশ" গ্রন্থাবলী প্রচারে সহায়তা করিবেন। আমরা আরও তিন খানা গ্রন্থ ছাপিতে দিতেছি। স্বামীজীর অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় উপরোক্ত গ্রন্থ তিন খানাও সুধী' মহানুভব সজ্জন সমাজে সমাদর লাভ করিবে এই আশা আমরা করিতেছি।

শ্রী ধীরপ্রকাশ ব্রহ্মচারী

সম্পাদক, আর্যসঙ্ঘ

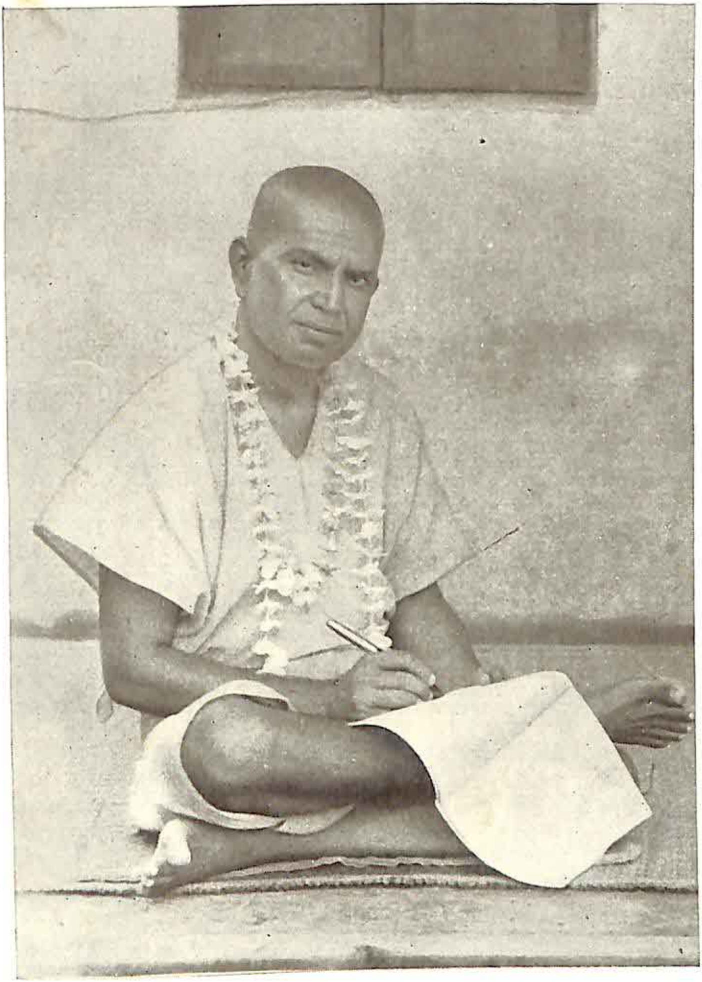
সমাধি গ্রন্থাবলী প্রকাশে সাহায্য দানের তালিকা

১। শ্রীসুবোধ চন্দ্র রায়—১০০০৲। ২। শ্রীঅধীর চন্দ্র রায়. বি-এস সি—৫০৲। ৩। ডাঃ শ্রীশিশির চন্দ্র রায়, এল-এম-এফ, ৫০৲। ৪। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দত্ত, বি-এ, ৫০৲। ৫। শ্রীসুধীর চন্দ্র রায়, ২৫৲। ৬। শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়, এল্-এম্-এফ্ ২৫৲। ৭। শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র রায়—২০৲। ৮। শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ—২০৲ ৯। শ্রীবিষ্ণু দয়াল চাকী—১০৲। ১০। শ্রীযোগেশ্বর চৌধুরী—১০৲। ১১। শ্রীজ্যোতিশ্বর চৌধুরী, কামার পাড়া—১০৲। ১২। ডাঃ শ্রীশ্রীশ চন্দ্র সরকার, গাইবাঁধা—৩০০৲ ১৩। শ্রীসুরেশ চন্দ্র সরকার, মধুপুর (রংপুর)—২৫৲। ১৪। শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র কুণ্ডু, সুজানগর (পাবনা) ৬২৲। ১৫। শ্রীনরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস,—২৫৲। ১৬। শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, নাওডুবী—১৫৲। ১৭। ঘোষ ব্রাদার্স, রাজবাড়ী—২৫৲। ১৮। শ্রীমনীন্দ্রমোহন দাস,—১৫৲। ১৯। শ্রীমতী দক্ষবালা সাহা—২০৲। ২০। শ্রীযোগেশ চন্দ্র দাস, বহরপুর—১০৲। ২১। ডাঃ শ্রীঅশ্বিনী কুমার ভৌমিক, মছলন্দপুর—২৫৲। ২২। শ্রীশ্রীশ চন্দ্র সরকার, শালবরাট—২৫৲। ২৩। ডাঃ শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মোদক, তেঁতুলিয়া—২৫৲। ২৪। শ্রীনরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস, মেঘচামী—১০৲। ২৫। শ্রীবিভূতি ভূষণ দাস, দুর্গাপুর—১৫৲। ২৬। শ্রীসতীশ চন্দ্র বিশ্বাস, শিধলাজুড়ি—২০৲। ২৭। শ্রীকান্তিভূষণ বিশ্বাস ১৫৲। ২৮। শ্রীশান্তিভূষণ বিশ্বাস—১০৲। ২৯। শ্রী শ্রীশ চন্দ্র বিশ্বাস—১০৲। ৩০। শ্রীতুষ্টলাল বিশ্বাস—১০৲। ৩১। শ্রীনগেন্দ্র নাথ সরকার—১০৲। ৩২। শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সরকার, বন্যতৈল—১০৲। ৩৩। শ্রীনরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস, জঙ্গল—১০৲। ৩৪। শ্রীসতীশচন্দ্র বিশ্বাস, পুষ আমলা—১০৲। ৩৫। শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বসু, বন্যতৈল—

১৫৲। ৩৬। শ্রীনন্দলাল বিশ্বাস দোরানগর (যশোহর)—১০৲। ৩৭। শ্রীনিকুঞ্জ ভূষণ কুণ্ডু, রাণাঘাট (নদীয়া)—১০৲। ৩৮। শ্রীনরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস, রাঁচি—৩০৲। ৩৯। শ্রীমুরারি মোহন শীল, সাব পোষ্ট মাষ্টার—২০৲। ৪০। শ্রীমতী ননীবালা দেবী, মনিহারি (বিহার)—১৫৲। ৪১। ডাঃ শ্রীসীতানাথ সিংহ—১০৲। ৪২। শ্রীবিজয় গোপাল সিংহ আগপোটরা—১০৲। ৪৩। শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সিকদার, নারায়ণপুর—২৫৲। ৪৪। শ্রীমুকুন্দলাল মল্লিক, আকৃগুকনা (ফরিদপুর)—১০৲। ৪৫। শ্রীঅহিভূষণ পাল—১০৲। ৪৬। শ্রীযামিনী ভূষণ পাল—২০৲। ৪৭। ডাঃ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ পাল, কুতবপুর (নদীয়া)—১০০৲। ৪৮। শ্রীনরেন্দ্র নাথ প্রামাণিক—২৫৲। ৪৯। শ্রীশ্রীধর চন্দ্র রায়, ২য় মুন্সেফ, বহরমপুর—২০৲। ৫০। শ্রীরাধাগোবিন্দ পাল—২৫৲। ৫১। শ্রীহারাধন পাল—৪০৲। ৫২। ডাঃ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র পাল এল্-এম্-এফ্—২০৲। ৫৩। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পাল বাগ—১০৲।৫৪। ডাঃ শ্রীহরেন্দ্র নাথ পালবাগ, এল্-এম্-এফ্—১০৲। ৫৫। শ্রীঅশ্বিনী কুমার পাল—২৫৲। ৫৬। শ্রীমলিনচন্দ্র পাল—১৭৷০। ৫৭। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ পাল—১০৲। ৫৮। শ্রীরঘুপদ পাল—১০৲। ৫৯। শ্রীনবগৌর পাল—১০৲। ৬০। শ্রীকমলাকান্ত পাল, জিতপুর—১০৲। ৬১। শ্রীরামরঞ্জন রুদ্র—১০৲। ৬২। শ্রীমতী সুভদ্রা সিংহ, গঙ্গাধারী—১০৲। ৬৩। শ্রীমতী পরমেশ্বরী পাল—২৫৲। ৬৪। শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী পাল, লক্ষ্মীনাথপুর—১০৲। ৬৫। শ্রীমতী ক্ষুদুমণি পাল, বাজিতপুর (মুর্শিদাবাদ)—১০৲। ৬৬। শ্রীমতী সরযুবালা ঘোষ, গোলকগঞ্জ (আসাম)—৭০৲। ৬৭। শ্রীরমেশচন্দ্র বসু, বাঁধাপানি চা বাগান (জলপাইগুড়ি)—৩৫৲। ৬৮। শ্রীবঙ্কেশ্বর কর্ম্মকার, ত্রিমোহনী—১০০৲। ৬৯। শ্রীপরমেশ্বর মজুমদার—১০৲। ৭০। শ্রীমাদার চন্দ্র বিশ্বাস—১০৲। ৭১। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী; কাশিমপুর—১০০৲। ৭২। শ্রীব্রজবাসী মজুমদার, বাগমারা—১৫৲। ৭৩

শ্রীতারিণীচরণ সরকার, ঘোষগ্রাম—১০৲। ৭৪। শ্রীকালীশঙ্কর সরকার, মহাদেবপুর (রাজসাহী)—২৫৲। ৭৫। শ্রীমতী সুরবালা দেবী কাব্যভারতী, কাঞ্চনপুর—৯৫৲। ৭৬। শ্রীরমেন্দ্রনাথ দত্ত, উকিল, জলেশ্বরীতলা—১০৲। ৭৭। শ্রীমতী কনকপ্রভা চাকী, কাটনার পাড়া —১০৲। ৭৮। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সান্যাল—১০৲। ৭৯। শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী, বাহুরতলা—২৫৲। ৮০। শ্রীমতী সরলাবালা পাল, শিববাটী (বগুড়া)—২৪০৲। ৮১। শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় (ডাঃ)—১০৲। ৮২। শ্রীনলিনীকান্ত অধিকারী, এ্যাডভোকেট, বালুরঘাট—১০৲। ৮৩। শ্রীসুকুমার গুহ, উকিল—১০৲। ৮৪। শ্রীসুকুমার ঘোষ, উকিল—১০৲। ৮৫। শ্রীমতী আশালতা ঘোষ—২০৲। ৮৬। শ্রীঋষিকেশ আগরওয়ালা, রায়গঞ্জ, (পশ্চিম দিনাজপুর)—২৫৲। ৮৭। শ্রীইন্দুভূষণ সেন—১০৲। ৮৮। শ্রীশচীন্দ্র দয়াল নিয়োগী, ভূপালপুর (পশ্চিম দিনাজপুর)—১০৲। ৮৯। শ্রীললিত মোহন কুণ্ডু (দিনাজপুর)—১০৲। ৯০। শ্রীনবকিশোর নন্দী, শিলিগুড়ি (দার্জিলিং)—১০৲। ৯১। শ্রীঅতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী—২০০৲। ৯২। শ্রীমতী সুধারাণী দেবী, বি. এ. কুমিল্লা—১০৲। ৯৩। শ্রীশীতল চন্দ্র মজুমদার, গয়া (উড়িষ্যা)—১০৲! ৯৪। শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় C. I. 'A', মালদহ—২৫৲। ৯৫। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, চাঁদপুর (নদীয়া)—১০৲। ৯৬। শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়, কুতবপুর—১০৲, ৯৭। শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মজুমদার, পুনা (বোম্বে)—৬০৲। ৯৮। শ্রীঅধর চন্দ্র সরকার নটী পাড়া, (ফরিদপুর)—১০৲। ৯৯। বালুর ঘাট ধর্ম সভা (১।২।১৮৭১ তাং) শ্রীপ্রফুল্ল কুমার নিয়োগী উকিল :—১০৲, শ্রীবসন্ত কুমার বন্দোপাধ্যায়, ডাক্তার,—২৫৲ এবং অন্যান্য—১৮॥০, ১০০। শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য,, সাপটগ্রাম, আসাম—২০০৲।

বিষয় সূচী ঃ—



পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীশ্রীস্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য মহারাজ।
পিতৃদেবের স্মৃতি রক্ষার্থে উৎসর্গীকৃত।
শ্রীশ্রীশচন্দ্র সরকার, গাইবান্ধা (রংপুর)

পল্লী বোধনে—অন্ন সমস্যা

১। পোড়া পেটের বিষম দায়। অন্ন সংস্থান পথ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ (১) বলিয়াছেন—"অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি" ॥ অর্থাৎ অন্নই ব্রহ্ম। যেহেতু অন্ন হইতেই এই সকল প্রাণী জন্মে, জন্মিয়া অন্নদ্বারা জীবন ধারণ করে এবং অন্নেতেই প্রতি গমন ও প্রবেশ করে"। পল্লীবাসী অন্নকে ব্রহ্ম, বিরাট্ করিয়া ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছে। পল্লীতে এই অন্নাভাব তাই প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। পল্লীবাসী, ভারতবাসী কি দিয়া এই অন্নসংস্থান করিবে? তাহাদের না আছে অন্ন, না আছে অর্থ। অন্ন ব্রহ্মের সাধনাই তাহার আশু প্রয়োজনীয়।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের আদেশে আর্ল ক্রোমার (তখন Finance Minister for India) ভারতবাসীর আয় গড়ে জন প্রতি ২৭৲ মাত্র স্থির করিয়াছিলেন। দাদা ভাই নৌরজী প্রমাণ করেন যে ভারতবাসীর আয় জন প্রতি গড়ে কুড়ি টাকার বেশী নহে। মিঃ ডিগ্বীর মতে ব্রিটিশ ভারতের ভারতবাসীর আয় গড়ে প্রতি জনে উর্দ্ধসংখ্যায় ১৭৷৷৹ মাত্র। লর্ড কার্জ্জন প্রত্যেক ভারতবাসীর আয় গড় পড়তায় বার্ষিক ত্রিশ টাকা মাত্র ধরিয়াছেন। জে রামসে ম্যাক্ডোনাল্ড্ (বৃটেনের ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী) ও উহা ৩০৲ এর বেশী নহে বলিয়াছেন। মিঃ ফিন্ড্লে সিরাস (Fridlay Shirras) ১৯১১ খৃষ্টাব্দে উহা প্রায় ৫০৲ ধরিয়াছেন।

(১) ভৃগুবল্লী, ২য় অনুবাক।

মিঃ কুক (Cook) ও ১৯২১ এ উহা ৫০৲ ধরিয়াছেন। প্রফেসর, কে, টি, সাহ ১৯২১-২২ খৃঃ উহা ৪৬৲ ধরিয়াছেন (২) বর্ত্তমানে ইহা অঙ্কের মাথায় আরও বাড়িয়াছে। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, এই যে গড় পড়তায় কিছু আয় বাড়িয়াছে, ইহা বড় বড় দেশী বিদেশী পুঁজিওয়ালা ও চাকুরিয়া বাবুদের লইয়া, যাঁহাদের মাহিয়ানা বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া এবং টাকার মূল্য সস্তা হওয়াতে। মুদ্রা স্ফীতি, চোরাই কারবারাদির ফাঁপা মুনাফা বাদ দিলে কেবল গরীব কৃষক ও শ্রমিক লইয়া হিসাব করিলে ভারতের আর্থিক অবস্থা গড় পড়তায় প্রায় একরূপই আছে যদি তুলনায় বর্ত্তমানে আরও হীনতর নাই হইয়া থাকে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাতের প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পদ গড়ে ৩৫০০৲ আমেরিকার ৮৬৪০৲, ফ্রান্সের ২৭৯০, জাপানের ২৮৬০৲, আর ভারতের ২৫০৲। ইংলণ্ডের প্রত্যেকের দৈনিক আয় ৬৸০, আমেরিকার ১৪॥০ জাপানের ৪॥৶০ আর ভারতের ৴৬। এই ছয় পয়সার স্থানে বর্ত্তমানে কিছু বাড়িয়াছে ধরিলেও তাহার দ্বারা এক সের চাউলও কেনা যায় না। পল্লীবাসী, ভারতবাসী কি খাইয়া বাঁচিবে? লর্ড কার্জ্জনের মতেও মাসিক ২॥০ দিয়া যে এক বেলার ও খালি দুটি অন্ন যোগান যায় না। কত ব্যত্তির যে অর্দ্ধাশনে অনশনে দিন গুজরান করিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। লড এস. পি. সিংহ ও ইহাদিগকে কেবল "Drawers of water and hewers of wood" বলিয়াছেন। এই যৎকিঞ্চিৎ আয়ও আবার বড় বড় লোকদের বেশী বেশী আয় ধরিয়া। মরণ আর কতদূর ? সব দেশের আয় ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, আর 'হাভাতে' ভারত বর্ষের আয় ক্রমশঃ কমিয়াই যাইতেছে।

(2) The Wealth and Taxable Capacity of India by K. T. Shah P. 68 (1924)

	আমেরিকা	ইংলণ্ড	ফ্রান্স	জাপান	ভারতবর্ষ
১৯১২—	৭।৵০	৩।।০	৩।০	৩/০	৵১৫
১৯১৮—	১০।০	৪/০	৪৲	৩৸০	৵৫
১৯২৪—	১৪।।/০	৬।৵০	৭।০	৪।।৶০	/১০

অর্থহীন ভারতবাসী একেত প্রায় মরণাপন্ন, তাহার উপর আবার তাহার 'মুখের গ্রাস' বিদেশে অবাধে রপ্তানী হইয়া মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পড়িতেছে। নিরন্ন ভারতের খাদ্য বিদেশে যেরূপ রপ্তানী হইয়া যাইতেছে তাহা প্রকৃতই বিষম ভয়াবহ। ভারত হইতে বিদেশে প্রত্যেক মিনিটে ২৩০মণ চাউল, ৭৫মণ গম, ৬০মণ মুসুরীর ডাউল, ৫০মণ অড়হকের ডাউল, ৬০মণ চীনে বাদাম রপ্তানী হইয়া যাইতেছে। এইরূপ আরও কত দ্রব্য যে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করে? কিছুদিন পূর্বে পাঞ্জাবের এক স্বাস্থ্য কমিশনার লিখিয়াছিলেন যে, সম্প্রতি শিয়াল কোটের হৃদয় বিদারক মৃত্যুহারে আমার ধারণা হইয়াছে যে দরিদ্রের অন্ন গ্রাস নৃশংসরূপে কাড়িয়া লওয়াই ইহার অন্যতম কারণ, বৈদেশিক ব্যবসায়ীগণ অবাধে গমের রপ্তানী করায় এতদঞ্চলের অধিবাসী দিগকে বার মাসই এই রূপ উপবাস করিতে হয়।

'সোনেকা হিন্দুস্থানে' স্বর্ণপ্রসূ ভারত লক্ষীর কোলে খাদ্যের অভাব এখনও নাই। এখনও তাহার উর্বর ক্ষেত্র ভরিয়া যথেষ্ট শস্য বিরাজ করে। ভারত লক্ষী আমাদিগকে বৎসরে গড়ে ৮০ (আশী) কোটী মণ ধান দান করেন। ২৫ বৎসর পূর্বে প্রায় ৮৬ কোটী মণ ধান্য জন্মিত। চীন দেশে ৬৪ কোটী মণ ধান্য জন্মে, আর জাপানে ১৫ কোটী মণ ধান্য জর্মে। ৬৪ কোটী মণ ধান্যে ৪০ কোটী চীনাবাসীর আর ১৫ কোটী মণ ধান্যে ৬ কোটী জাপানীর পেট ভরিতে পারে, আর ভারতবাসীকেই শুধু জঠর

জ্বালায় হাহাকার করিতে হইবে? শোষণ শাসনে ভারতবাসী অর্থহীন, অন্নহীন। বিদেশী তাহার মুখের গ্রাস তাহার কোল হইতে ছিনাইয়া কিনিয়া লইয়া চলিয়া যায়, ভারতবাসীর তাহা রোধ করিবার অর্থ নাই সামর্থ্য নাই, রাজনৈতিক শক্তি নাই। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভূতপূর্ব ভারত সচিব লর্ড স্যালিশবারী (ইনি তিনবার সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন) স্পষ্ট মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছিলেন "India must be bled white" ভারতবর্ষকে শুষিয়া রক্তশূন্য করিতে হইবে! ভারতবর্ষকে শুষিয়া রক্তশূন্য করার নীতির ফলে ভারত বাসীর এবং অধিকন্তু পল্লীবাসীর যে নিদারুণ দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহার সাক্ষ্য পার্লিয়ামেণ্টের 'Independent labour party'র 'Indian Advisory Committee'র রিপোর্টে ইংরাজেরাই দিয়াছেন। "Whether one looks at the urban or the rural section of the population, one is struck first and foremost by the appalling state of poverty prevailing everywhere. Forty millions of people, according to one great Anglo-Indian authority, Sir William Hunter, pass through life with only one meal a day. According to another authority, Sir Charles Elliot one half of the agricultural population of India, which Mr. G. K. Gokhale calculated to be seventy millions, go hungry from day to day, not having even one single square meal during the course of a whole year ; and the standard of a square meal adopted is no higher than the food supplied in the Indian prisons.

Professor Gilbert slater, who has an intimate acquaintance with labour-conditions both in India and in Britain

writing about the poverty of the Indian peasant says, "A reasonable estimate of money income perhead would be, for the present day somewhere about $4\frac{1}{2}$ d. a day. Taking the whole population together rich and poor, it may be said that about two fifths of the available income (i. e, $1\frac{4}{5}$ d. per day) must be spent merely on the grains that form the basis of the Indian dietary rice, millets and wheat; ....this or something like this being the average condition, that of the poorest classes can be guessed. A detailed examination, family by family, of a Madras pariah settlement in the middle of the city, showed an average income of only $2\frac{1}{4}$ d. per head per day, which means a $\frac{1}{2}$ d per day in addition to a bare sufficiency of rice ; and a very recent enquiry in the Godaveri Delta yielded an estimate of an average income of only 1d. per head per day of those people, and of those kindred castes, on whose labour the cultivation of the rice fields of southern India mainly depends ; it may be said generally that their earnings in grain and coin barely suffice for the subsistence of families, large enough to maintain their numbers, from one generation to another the surplus offspring dying, that they are habitually hungry ; and that it is only because they make their own huts in their spare time, collect their own fuel, need scarcely any clothing and enjoy abundant sunshine, that they can subsit at all." অধিবাসী-দিগের পৌর বা জানপদ যে অংশের দিকেই কেহ দৃষ্টিপাত করুক না কেন, সর্বত্র বিরাজমান দারিদ্র্যের ভয়ঙ্কর অবস্থা দর্শনে সে

সর্ব প্রথমেই আকৃষ্ট হইবে। একজন ইঙ্গভারতীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি স্যার উইলিয়াম হাণ্টার এর মতে চারি কোটী লোক কেবল মাত্র একবেলা আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। স্যর চার্লস্ ইলিয়ট নামক আর এক অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতে ভারতের কৃষি জীবীর অর্ধাংশ যাহা মিঃ জি. কে. গোখেল মহাশয়ের গনণায় সপ্তকোটী, প্রতিদিনই ক্ষুধা কাতর থাকে এবং সমগ্র বৎসরের মধ্যে তাহারা একটী দিন মাত্রও পূর্ণাহার পায় না, আর তাহাদের এই পূর্ণাহারের নিদর্শন ভারতীয় কারাগারে যে খাদ্য সরবরাহ করা হইয়া থাকে তাহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নহে।

ভারতীয় কৃষক দিগের দারিদ্র্য সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া ভারতে এবং ব্রিটেনে শ্রমজীবীদিগের অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় সম্পন্ন স্যার জিলবার্ট স্লেটার বলেন ঃ-মাথাপ্রতি আর্থিক আয়ের ন্যায্য নির্ধারণ বর্তমানে দৈনন্দিন প্রায় সাড়ে চারি আনার নিকটবর্তী হইবে। ধনী দরিদ্র সমগ্র লোক লইয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে তাহাদিগের লভ্য আয়ের প্রায় $\frac{২}{৫}$ অংশ (অর্থাৎ দৈনন্দিন ১$\frac{৪}{৫}$ আনা) কেবলমাত্র শস্যেই ব্যয় করিতে হইবে; এই শস্যই, চাউল, চীনে চাউল (এক প্রকার ক্ষুদ্র চাউল) ও গম ভারতীয় খাদ্যের প্রধান অংশ……সাধারণ অবস্থা এইরূপ বা এবম্প্রকার কিছু হইলে দরিদ্রতম শ্রেণীর অবস্থা অনুমিত হইতে পারে। মান্দ্রাজ সহরের মধ্যস্থ এক পারিয়া নিবাসে প্রত্যেক পরিবারে পরিবারে বিশেষরূপে পরীক্ষা করায় দেখা গিয়াছে যে মাথা প্রতি দৈনন্দিন আয় গড়পড়তায় কেবল মাত্র ২$\frac{১}{৪}$ আনা; ইহার অর্থ নাম মাত্র পর্য্যাপ্ত চাউলের উপর দৈনন্দিন $\frac{১}{২}$ আনা মাত্র; এবং খুব সম্প্রতি গোদাবরী বদ্বীপের অনুসন্ধানে গড় পড়তায় মাথাপ্রতি দৈনন্দিন ১ আনা (৴০) মাত্র পাওয়া গিয়াছে। উত্তর ভারতের

ধান্য জমির চাষ প্রধানতঃ যাহাদিগের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে সেই সমস্ত লোক সম্বন্ধে এবং তদনুরূপ জাতি সম্বন্ধে ইহা সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে যে, শস্যে এবং মুদ্রায় তাহাদিগের যে আয় হয় তাহা তাহাদিগের পরিবার বর্গের, যে পরিবার বর্গের সংখ্যা বংশ হইতে বংশান্তর পর্যন্ত বহুই থাকিয়া যায় এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত শিশুগুলি মরিয়া যায়, সেই পরিবার বর্গের জীবিকা নির্ব্বাহ পক্ষে কদাচিৎ পর্য্যাপ্ত ; বলা যাইতে পারে যে, তাহারা স্বভাবতঃই ক্ষুধার্ত ; এবং তাহারা যে আদৌ জীবন ধারণ করিতে পারে তাহার কারণ কেবল মাত্র এই যে তাহাদিগের অবসর সময়ে তাহারা তাহাদিগের গৃহনির্ম্মাণ করে, নিজেদের (অগ্নির জন্য) কাষ্ঠাদি আহরণ করে, কাপড় চোপড়ের প্রয়োজন তাহাদিগের অতীব কম, এবং পর্য্যাপ্ত সূর্য্য কিরণ ভোগ করে। বঙ্গের ভূতপূর্ব ছোটলাট সার চার্লস্ ইলিয়ট বলিয়াছিলেন :—"I do not hesitate to say that half our agricultural population never know from year's end to year's end what it is to have their hunger fully satisfied." ব্রিটিশ ভারতীয় কৃষিজীবীর অর্দ্ধাংশও বৎসর হইতে বৎসরের মধ্যে একদিনও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না ; ক্ষুধা নিবৃত্তির সুখ তাহারা কখনও জানে না। এলাহাবাদের 'পাইওনিয়ার' সংবাদ পত্র ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গ্রীয়ার্সনের তথ্যাবলী (Grierson's statistis) অনুযায়ী লিখিয়াছিল "Briefly, it is that all persons of the labouring classes and ten percent of the cultivating and artisan classes or forty five percent of the total population are insufficiently fed or housed or both. It follows that nearly one hundred millions of people in British India are living in extreme poverty."—

সংক্ষেপতঃ ইহা এই যে, শ্রমিক সম্প্রদায়ের সকলেই, কৃষক এবং শিল্পকর সম্প্রদায়ের শতকরা দশমাংশ অথবা সমগ্র লোক সংখ্যার শতকরা ৪৫ অংশ পর্য্যাপ্ত অন্ন, পর্যাপ্ত গৃহ বা পর্য্যাপ্ত অন্নবস্ত্র উভয়ই পায় না। ইহাতে এই আসে যে ব্রিটিশ ভারতের প্রায় দশ কোটি লোক চরম দারিদ্র্যে বাস করিতেছে। পল্লীবাসীর দুর্দ্দশার সাক্ষ্য এশিয়া খণ্ড পরিভ্রমণকারী বিখ্যাত চিকিৎসক সার (ফ্রেডারিক ট্রীভ্‌স্ মহোদয় তাঁহার 'The Other Side of the Lantern' গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—"India leaves on the mind an impression of poorness and melancholy........Sadder than the country are the common people of it. They are lean and weary looking, their clothing is scanty, they all seem poor and toiling for leave to live.........They appear feeble and depressed"—ভারতবর্ষ মনের উপর দারিদ্র্য এবং বিষণ্ণতার স্মৃতি রাখিয়া দেয়। দেশ অপেক্ষা দেশের সাধারণ লোকগুলি বিষণ্ণতর। তাহারা কৃশ এবং ক্লান্ত দর্শন, তাহাদিগের পরিচ্ছদ সামান্য, তাহারা সকলেই দরিদ্র বলিয়া বিবেচিত হয় এবং বাঁচিবার অবকাশের জন্যই পরিশ্রম করিতেছে। তাহারা দুর্বল এবং বিষণ্ণরূপে দৃষ্ট হয়। মিঃ ডিগবী ('Prosperous' British India, P- II8) দেখাইয়াছেন যে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একশত সাত বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে মোট প্রায় ৫০ লক্ষ লোক হত হইয়াছিল। আর ঐ সময়ে ভারতবর্ষে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ লোক কেবল 'পেটের পোড়ায়' মারা গিয়াছে। ১০৭ বৎসরের সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধে মারামারি করিয়া মরিল ৫০ লক্ষ, আর ১৩৫০ সালে এক বাংলাতেই দুভিক্ষে ৫০ লক্ষ লোক মরিল পেটের পোড়ার সঙ্গে লড়াই

করিয়া। গত বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীতে মরিল মারামারি করিয়া ৩১/২ কোটি পৃথিবীর লোক ৬ বৎসরে, আর ১৩৫০ হইতে ১৩৫৩ এই সাড়ে তিন বছরে বাঙ্গলায় মরিল না খাইয়া প্রায় ২ কোটি বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান মোছলেম লীগ মন্ত্রীত্বের আমলে।

"বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের (মুস্লিম লীগের) অসামরিক সরবরাহ ও অন্যান্য বিভাগের ব্যয়ভার সম্পর্কে বাঙ্গলার একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিস দেড় কোটিরও অধিক টাকার হিসাব রক্ষা সম্বন্ধে অসঙ্গতির কথা বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উপরিউক্ত অর্থের কোন রসিদ অথবা নিয়মিত কোন হিসাব রাখা হয় নাই।"—যুগান্তর, ১ম পৃঃ, ১৬। ৪। ১৩৫৪ বিশ্বের দরবারে আজ মোছলেম লীগ শাসন খুনে ডাকাত অপেক্ষাও কোটি গুণ মহাপাপে অভিযুক্ত। দারিদ্র্যই ইহার কারণ। " The most trying experience I ever had was a three week's tour in September of last year (1901). My tent was surrounded day and night, and one sentence dinned perpetully into my ears. We are dying of lack of food.' People are living on one meal every two or three days. I once carefully examined the earnings of a congregation of three hundered, and found the average amounted to less than one farthing a head per day. They did not live, they eked out an existence. I have been in huts, where the people were living on carrion. Yet in all these cases, there was NO RECOGNIZED FAMINE In Heaven's name, if this is not famine, what is it? The extreme proverty of the poorer classes of India offers conditions altogether extraordinary. Life is the

narrowest and hardest conceivable, with no prospect of any improvement" (Digby: 'Condition of the People of India', 1902. p.p. 14-15.) অর্থাৎ গত বৎসরের (১৯০১) সেপ্টেম্বরে আমার যে তিন সপ্তাহব্যাপী পর্য্যটন হইয়াছিল তাহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর অভিজ্ঞতা। আমার তাঁবু দিবারাত্রি পরিবেষ্টিত ছিল এবং এক বাক্যই অনবরত আমার কাণে ধ্বনিত হইতেছিল "আমরা খাদ্যাভাবে মরিতেছি।" লোকেরা প্রতি ২।৩ দিনে একবার মাত্র আহার করিয়া বাঁচিয়া আছে। আমি একবার যত্ন সহকারে তিনশত লোকের এক সভার আয় পরীক্ষা করিয়া দেখি যে মাথা প্রতি দৈনন্দিন আয় গড়ে এক পয়সারও কম। তাহারা বাঁচিয়া ছিল না। তাহারা কোনো রকমে টিকিয়া ছিল। আমি এমন সমস্ত কুটীরে গিয়াছি যেখানে লোকে পূতিমাংস খাইয়া বাঁচিতেছিল। অথচ এই সমস্ত ব্যাপারে কোনও **স্বীকৃত দুর্ভিক্ষ ছিল না** (অর্থাৎ সরকারী মহলে ইহাও দুর্ভিক্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল না।) ভগবানের নামে ইহা যদি দুর্ভিক্ষ নহে, তবে দুর্ভিক্ষ কি? ভারতের দরিদ্রতর শ্রেণীর চরম দারিদ্র্য অবস্থা সম্পূর্ণই অসাধারণ। জীবন যতদূর চিন্তাকরা যায় ততদূর সঙ্কীর্ণতম এবং কঠোরতম এবং ইহার ভবিষ্যতে উন্নতির কোনও প্রত্যাশাও নাই। এই উক্তির দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরেও কি সে প্রত্যাশার মৃদুগুঞ্জন আসিয়াছে? ইতিহাস মৃত্যু লেখায় সাক্ষ্য দিতেছে—আসে নাই প্রত্যাশার কোনো গুঞ্জন; আসিয়াছে কেবল নিরাশার কলিজা দলা, মর্মভাঙ্গা হাহাকার তীব্র আর্তনাদে! অধ্যাপক সিলি তাঁহার 'Expansion of England' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "Their (Indian's) susce ptibilities dulled and their very wishes crushed out by want." তাহাদের অনুভব ক্ষমতা নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে এবং

তাহাদের ইচ্ছা পর্য্যন্ত অভাবে নিষ্পেষিত হইয়াছে। "The sole aspiration of the poor ryot in India is that she may not die of starvation before her next harvest be ripe."—Jhon Cooper. :—ভারতের দরিদ্র রায়তের কেবল মাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই যে সে যেন পরবর্ত্তী ফসল পক্ক হইবার পূর্ব্বে অনাহারে মারা না যায়। "One third population of India is insufficiently fed, four crores of people lie down in one meal."—Dr. A. Zariah. ভারতের এক তৃতীয়াংশ লোক অপর্যাপ্ত বা অল্পাহার পায়; চারি কোটি লোক একাহার মাত্র করিয়া থাকে। ভারতের তথাকথিত নিম্নবর্ণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রফেসর ই. পি. হরউইজ (Prof. E. P. Horwitz, Lecturer in Sanskrit and Oriental Culture in the city of New York College) বলিয়াছেন—"The abject proverty among the depressed classes is appalling to any visitor from the west." —The A. B. Patrika, 19. 1. 1928. অর্থাৎ:—পাশ্চাত্য হইতে যে কোন দর্শকের নিকট অবনত সম্প্রদায়ের দীন দারিদ্র্য ভয়ঙ্কর। Mr. Fenner Brockway, Labour M. P. বলিয়াছেন—"In the towns and villages alike the workers of India are existing in the wretchedest condition of poverty." ভারতের শ্রমিকেরা নগর সমূহে এবং পল্লীসমূহে তুল্যভাবে দারিদ্র্যের চরম দশায় আছে। Mr. Thurtle Labour M, P. বলেন,—

"As I expecetd, I have found great proverty amongst the masses of India both agricultural and industrial"—The Amrita Bazar Patrika, 20. 3. 28. আমি যেরূপ আশা করিয়াছিলাম কৃষি এবং শিল্প সম্বন্ধীয় উভয়বিধ ভারতীয় জন সাধারণের মধ্যে মহা দারিদ্র্য দেখিয়াছি। কিন্তু দূত

রয়টার কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া লেবার এম.পি.মিঃ পার্শেল (Parcell) বিলাতে যাহা বলিয়াছেন তাহা ভারত বাসীর দুর্দশার ও দুরবস্থার একটী উলঙ্গ চিত্র, একটী নগ্ন, ভগ্ন হাহাকারের তীব্র আর্তনাদ।"Nearly 300 millons of human beings in India are underfed, ill clad and frightfully housed. The light cf knowiedge is denied them. Millions of bread winners men, women and children are sweated and fleeced of their pitiful wages which are reduced almost to a vanishing point. A ghastiy state of proverty, semi-starvation, ill health and disease prevails which is almost inconceivable in the light of the country's wonderful natural resources"—The A. B. Patrika, 3. 4. 28. ভারতেয় প্রায় ৩০ কোটী মানব প্রাণী কমভুক্ত, মন্দাবৃত এবং ভয়ঙ্কর আবাসস্থিত, শিক্ষার আলোক হইতে তাহারা বঞ্চিত। লক্ষ লক্ষ অন্ন উপার্জন কারী পুরুষ, স্ত্রী এবং শিশুকে ঘর্মাক্ত করাইয়া তাহাদিগের যৎকিঞ্চিৎ বেতন পীড়ন করিয়া অপহরণ করা হয়, যে বেতন প্রায় অদর্শন প্রাপ্ত বিন্দুতে পরিণত হয়। দারিদ্র্যের এক বিরাট অবস্থা, অর্ধ অনাহার, ভগ্নস্বাস্থ্য এবং পীড়া বিরাজ করিতেছে; দেশের বিস্ময়কর প্রাকৃতিক সম্পদের বিবেচনায় ইহা প্রায় অচিন্তনীয়। আমরা যে মরিতে বসিয়াছি তাহা পর্যন্ত কর্তারা সরকারী কাগজে কলমে স্বীকার করিতে চাহেন না; তাই কর্তাদের জাত ভাইদের এতগুলি নজির দিয়া প্রমাণ করিতে হয় যে আমরা যমের বাড়ী যাত্রা সুরু করিয়াছি। হায়রে দুর্ভাগ্য! এইরূপ যাহাদের দুর্দশা তাহাদিগের মুখের গ্রাসটুকুও যদি বিদেশে রপ্তানী হইতে দেওয়া হয় তবে তাহাদিগের দুঃখ দুর্দশা যে 'ষোলকলা'য় পূর্ণ হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

এইরূপ অবাধ রপ্তানীর ফলে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য যে কিরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহা প্রধান তিনটী খাদ্যের নিম্ন তালিকাই নির্দেশ করিতেছে।

	১৭৩৮	১৭৫০	১৭৫৮	১৭৮২	১৮২৫	১৮৫৪	১৮৮০	১৯২৫	১৯৩৬
প্রতিটাকায়	মনসের	মনসের	মনসের	মনসের	সের	সের	সের	সের	সের
চাউল	২-৩০ ;	২-১০ ;	১-৩০ ;	১-৫ ;	৩০ ;	১৫ ,	১২ ;	৫ ;	২
আটা	২-২০ ;	২-১০ ;	১-৩৫ ;	১-৫ ;	৩২ ;	১৯ ,	১১ ;	৪॥০	১॥০
সরিষাতেল	-১২ ;	-১০ ;	-৮॥ ;	-৭ ;	৬ ;	৫ ;	৪॥০ ;	১॥০ ;	।৵০

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নবাব মীরজাফরের সময় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বঙ্গদেশে কিরূপ ছিল তাহার একটী তালিকা আমরা ঐ নবাব ও তাঁহার লোকের খাদ্যদ্রব্যের একটি তালিকা হইতে পাই। গভর্ণর ভান্সিটার্ট নবাব মীরজাফরকে চন্দন নগরের নিকট গরুটিতে যখন অভ্যর্থনা করেন তখন নবাব ও তাঁহার সঙ্গের লোকের খাদ্যদ্রব্যের তালিকা এইরূপ ছিল ঃ-৪০মণ ভাল চাউল ৭৫৲ ; ৮ মণ ডাল ২০৴০ ; ৫ মণ ঘৃত-৭৭৲ ; ৬ মণ-তেল-৫১৲ ; ৩॥ মণ লবন ৪।৵০ ; ৮ মণ ময়দা ২৭৲ ; ৫মণ চিনি-৩৬।০ ; ৬মণ মিষ্টান্ন-৬০৲ ; ১মণ মোরোব্বা ১৯৲ ১মণ কিস্‌মিস বাদাম-৩১।০ ; ৮ মণ দধি-২১।০ ; ৫০টা ছাগল ৫০৲ ইত্যাদি।" [সত্যচরণ শাস্ত্রীর গ্রন্থাবলী, (মহারাজ নন্দকুমার চরিত,) ৪৮১ পৃঃ] অর্থাৎ প্রতিটাকায় ২১ সের চাউল, ১৬ সের ডাইল, ২॥ সের ঘৃত, ৪৸০ সের তৈল পাওয়া যাইত ; লবণের সের ছিল দুই পয়সা, প্রতিটাকায় প্রায় ১২ সের ময়দা পাওয়া যাইত ; চিনির সের ছিল ১১ পয়সা ; চারি আনায় একসের মিষ্টান্ন মিলিত ; কিস্‌মিস্ বাদামের সের ছিল ৸১০ আনা ; দধির মণ ছিল প্রায় ২॥৵০ ; আর একটা পাঁঠার দাম ছিল ১৲। পৌণে দুইশত বৎসর পূর্ব্বের এই সস্তা দর কাহার অত্যাচার, নির্য্যাতনে উড়িয়া গেল ? কোন্ রাক্ষসীর বিষ নিঃশ্বাসে পচিয়া নষ্ট হইয়া গেল ?

এই নিদারুণ দারিদ্র্যের প্রধান কারণ যে শাসন কর্তাদের নিষ্ঠুর শোষণ লীলা তাহা লর্ড স্যালিসবারি স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। স্যার হেনরী ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান (Sir Henry campbell Bannermann) বলিয়াছেন :—"Famine stricken India is being bled for the maintenance of England's world wide Empire" ইংলণ্ডের জগৎব্যাপী সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ভারতবর্ষের রক্ত মোক্ষণ করা হইতেছে। 'The Law of Civilsation and Decay' গ্রন্থে (p.259) ব্রুকস্ এডাম্‌স্ (Mr. Brooks Adams) বলেন—"Very soon after Plassy (It was faught in *1*757), the Bengal plunder began to arrive in London, and, the effect appears to have been instantaneous, for all authorities agree that the 'industrial revolution' the event which has divided the nineteenth century from all antecedent time began with the year 1760." অর্থাৎ পলাশীর অব্যবহিত পরেই (পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে হয়) বঙ্গের লুণ্ঠন লণ্ডনে আসিতে লাগিল এবং ইহার ফল তৎক্ষণমাত্র সংঘটিত বোধ হইতে লাগিল, কারণ সমস্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই এবিষয়ে একমত যে, যে ঘটনা উনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত পুর্বকাল হইতে উনবিংশ শতাব্দীকে পৃথক করিয়াছে সেই শিল্প সম্বন্ধীয় পরিবর্তন (Industrial Revolution), ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হয়। এই লেখক আরও বলিতেছেন "These hoards the savings of millions of human beings for centuries the English seized and took to London ......what the value of the treasure was no man can estimate but it must have been millions of pounds." —The Law of Civilization and Decay, Brooks

Adams, p. 205. অনেক শতাব্দী ধরিয়া লক্ষ লক্ষ মানবের উপার্জন এই সব সঞ্চিত ধন ইংরাজেরা দখল করেন এবং লণ্ডনে লইয়া যান। ··· · এই ধনের মূল্য কত ছিল তাহা কেহই নির্ধারণ করিতে পারেন না, কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই কোটী কোটী টাকা হইবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেকটরেরাই ১৮১১ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন "the vast fortunes acquired in the inland trade (in India) had been obtained by the most tyrannic and oppressive conduct that was ever known in any age or country. যে কোন কালে যে কোন দেশে যাহা কখন জ্ঞাত হইয়াছিল এইরূপ চরম নিষ্ঠুরতা এবং অত্যাচার পূর্ণ ব্যবহারের দ্বারাই অন্তর্বাণিজ্যে (ভারতে) এই বিপুল ধন উপার্জিত হইয়াছিল। বার্ক (Burke) বলিয়াছেন "the English army of traders in their march ravaged worse than a Tartarian conqueror. The trade they carried on more resembled robbery than commerce" ইংরাজ বনিক সৈন্যদল তাহাদিগের অভিযানে কোন তাতার দেশীয় বিজেতা অপেক্ষা অধিকতর খারপভাবে লুণ্ঠন করিয়াছিল। তাহারা যে ব্যবসায় চালাইয়াছিল তাহা বাণিজ্য অপেক্ষা দস্যুতার সহিতই অধিকতর সাদৃশ্য সম্পন্ন। এই 'Bengal Plunder' স্থানে বর্তমানে 'Indian Plunder' হইয়াছে এই যা তফাৎ। "Possibly since the world began no invest ment has ever yielded the profit reaped from the Indian plunder" —The Law of Civilisation and Decay, Brooks Adams, p. 263. সম্ভবত পৃথিবী হওয়ার পরে ভারতীয় লুণ্ঠন হইতে যে লাভ সংগ্রহ করা হইয়াছে, আর কোনও লগ্নী এরূপ লাভ দেয় নাই। কিছুদিন পুর্বে Sir W. Joynson Hicks 'চাঁচা ছোলা' ভাষায় ইংরাজের মতলব প্রকাশ করিয়াছেন। এই অবাধ

লুণ্ঠন ও শোষণের কতক বিবরণ উইলিয়ম ডিগবী সি. আই. ই. মহোদয়ও দিয়াছেন 'Prosperous' British India" গ্রন্থে। ডিগবী বলেন "Because among other things we have destroyed native industries and besides, have taken from India since 1834-5" (according to a calculation made by that sane and moderate journal 'The Economist' two years ago in 1898) more than ten thousand millions of Rupees. India on the other hand has entirely lost her much more than ten thousand millions; this with interest and if calculated in the ordinary way among her people, at 5 p. c. interest value only would by this time have been of the value at least of fifty thousand millions of Rupees" — ভারতবাসীর দারিদ্র্যের কারণের মধ্যে একটা ভারতের শিল্পের ধ্বংশ, অপরটি অর্থ শোষণ। আমরা (ইংরাজেরা) ভারতীয় শিল্পের ধ্বংশ সাধন করিয়াছি এবং ১৮৩৪-৩৫খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৮ পর্যন্ত ('ইকনমিষ্ট' সংবাদ পত্রের গণনায়) এক সহস্র কোটী টাকা ভারতবাসীর নিকট হইতে লইয়াছি। এই এক সহস্র কোটী টাকা যদি ভারতবর্ষে থাকিত এবং শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা সুদে ভারতবাসীর মধ্যে খাটাইলে উহা এতদিন পাঁচ সহস্র কোটী টাকায় পরিণত হইত। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে রাজস্ব এবং বিলাতী মহাজনগণের লাভে বৎসরে পাঁচ শত কোটী টাকা বিদেশে যাইতেছে। ১৯০০ হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই হিসাবেও ১৩ হাজার ৫ শত কোটী টাকার উপর এদেশ হইতে শোষিত হইয়াছে। গত প্রথম ইউরোপীয় সমরে ইংলণ্ড যে কিছুকাল দৈনন্দিন ১২ কোটী টাকা এবং দ্বিতীয় ইউরোপীয় সমরে দৈনন্দিন প্রায় ২১ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছে তাহা এই

ভারতরূপী গোগৃহের পল্লীবাসীরূপী কামধেনু ছাড়া আর কে দিয়াছে? ব্রিটিশ ভারতের লোক সংখ্যা বর্ত্তমানে ৪০ কোটী ধরিলেও বৎসরে প্রায় পনর টাকা (১৫৲) প্রত্যেক ভারতবাসীকে বিদেশে পাঠাইতে হইয়াছে। ভারতবাসীর বার্ষিক আয় জনপ্রতি পনর টাকা বা কুড়ি টাকা। তাহার প্রায় সবটাই বিদেশে দিলে ভারতবাসীর পূর্ণ শূন্যত্বের আর বাকী কি? এখন Algebra (বীজ গণিতের) র minus power (হ্রাস ক্ষমতা) বাড়িতেছে আর কি?

অর্দ্ধাশন, অনশন, উপবাস সহিষ্ণু ভারতবাসী কিছু ভাত বা রুটী এবং একটু লবণ পেলেই বাঁচিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু আমাদের নিমক খাইয়া যে বিদেশী পরিপুষ্ট সে আমাদিগকে বিনা ট্যাক্সে এই নিমক খাইতেও দিবে না। অথচ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় লবণের ব্যবসার দ্বারা অসংখ্য লোক প্রতিপালিত হইত। "নিম্ন বাঙ্গলা লবণ প্রস্তুতের জন্য সেকালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। আমাদের দেশ হইতে লবণ লইবার জন্য দলে দলে কাশ্মীরী, মুলতানী, শিখ, সন্ন্যাসী, (সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে গোঁসাইরা বাণিজ্য করিয়া বিশেষ ধনবান্ হইয়াছিলেন) ভাটিয়া প্রভৃতি নানা দেশের লোক আগমন করিত। ইহাতে আমাদের দেশের লোকেরা যথেষ্ট পয়সা উপার্জ্জন করিত। কোম্পানীর ভৃত্যগণ লবণের ব্যবসা একচেটে করায় বিদেশীয় বণিকদিগের বাঙ্গলায় আগমনের পথ রোধ হইয়া যায়। বাঙ্গলায় লবণের ব্যবসায়ে অসংখ্য লোক প্রতিপালিত হইতেছিল, কিন্তু কোম্পানীর অবিচারে দেশীয় লোকদিগকেও বিশেষ ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল।" —সত্যচরণ শাস্ত্রীর গ্রন্থাবলী (মহারাজ নন্দকুমার চরিত); ৪৩৫ পৃঃ। ভারতে লবণের অভাব নাই। লবণাম্বুধি যাহার তিনদিকে তাহারও লবণাভাব? অর্থহীন ভারতবাসীর দুই গ্রাস অন্ন যদি জোটে তবে

তাহাকে গ্রামে গ্রামে ট্যাক্স দিতে হয়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আমরা এক লবণের ট্যাক্সই দিয়াছি প্রায় ৮ কোটী টাকা। অনেক আবেদন, নিবেদন আন্দোলনের ফলে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইহা ৭ কোটীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু ১৯২৮-২৯ এ ইহা ৭ কোটীর উপরেই গিয়াছে। আর বর্ত্তমানে উহা প্রায় ৯ কোটীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারত সরকারের মোট রাজস্ব আয় প্রায় দুই শত ত্রিশ চল্লিশ কোটী টাকা। ভারত সরকারের আয়ের প্রায় ষোল ভাগের এক ভাগ এই 'হা ভাতে' ভারতবাসীর নিমকের উপর। হিন্দুরাজত্বে বা মোগল রাজত্বে ভারতবাসীকে কখনও নিমকের ট্যাক্স দিতে হয় নাই; জগতের কোন দেশেই লবণের উপর কর নাই, আছে কেবল সৃষ্টি ছাড়া ভারত রাজ্যে। 'নিমক হারামী' আর কাহাকে বলে! ওরে মূর্খ, পরাধীন, পদদলিত, নির্জীব ভারতবাসী, দুটো নুন ভাত হইতেও তুই বঞ্চিত হইতেছিস্ তোরই দারুণ পাপের ফলে, তোরই স্বকৃত কর্ম্মফলে। এককোটী বা অর্ধ কোটী ভারতবাসী যদি এই নিমকের কর দিতে সঙ্কল্প না করে, সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ পল্লীবাসী যদি বিনা ট্যাক্সে লবণ প্রস্তুত করিতে থাকে, তবে দুই চারি মাসেই লবণ শুল্ক উঠিয়া যায়। লবণের মূল্য মণ (৮২ পাউণ্ড) প্রতি দশ পাই, ইহার উপর শুল্ক ২০ আনা বা ২৪০ পাই। মূল্যের এই ২৪ গুণ শুল্ক মহা গর্দভেও দেয় না। শতকরা ২৪০০৲ শুল্ক হায় ভারতবাসী, তুমি দিবে কোন্ মুখে? ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াও তাহা পথের মাঝে ছত্রভঙ্গ হইল কেন? গান্ধীজী আশা দিয়াছিলেন বর্তমানের নেহরু নেতৃত্বে অন্তবর্তী কেন্দ্রীয় সরকার এটা নাকি শীঘ্রই করিবেন। আশায় থাকা ভাল! মহামূর্খ ভারতবাসী; ঘৃণ্য ভারতবাসী, ভারতরাষ্ট্রে আজিও তাহা সর্বত্র হইল না স্বাধীন ভারতেও। ভারত রাষ্ট্রে

লবণ প্রস্তুতের নিয়ম অনেকটা শিথিল হইলেও নিমকের উপর ট্যাক্স্ লবণ কর একেবারে উঠিয়া যায় নাই। আর পাকিস্থানে পূর্ববঙ্গে লবণের দামে দ্বিগুণ বৃদ্ধি ট্যাক্সে। বাঙ্গালীর কী আশা? তবুও পরপদলেহী কুক্কুর তুল্য ভারতবাসী, বাঙ্গালী! তোর দুরবস্থা, চরম দুর্দশার কথাও তোকে শুনাইতে হয়, বুঝাইতে হয়। জগৎ সভায় তুমি আজ চণ্ডাল, পারিয়া, মুচি, মেথর, ডোম, মুর্দ্দফরাস। স্বাধীন দেশের চণ্ডাল, পারিয়া, মুচি, মেথর, ডোম, মুর্দ্দফরাসের ও মর্যাদা আছে, পবিত্র সাধনা আছে, পূতযজ্ঞ আছে। তোমার আছে কি? নির্জীবত্ব, ক্লীবত্ব, পশুত্ব, কীটত্ব! যাও পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। দেশ মাতৃকার জন্য ধর্মক্ষেত্রে পল্লী প্রাঙ্গনে ধর্মযজ্ঞ আরম্ভ কর। আহুতি তাহাতে স্বার্থদান, বলিদান আত্মোৎসর্গ; দেবীর মহাভোগে অন্ন সংস্থানে কাঙ্গালী ভোজন 'মহোৎসব'।

এই বুভুক্ষিত দেশবাসীকে আগে অন্ন সংস্থানের পথ দেখাইয়া দিতে হইবে। "সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলার" দেশে এখনও অন্ন কম জন্মে না। ইংলণ্ড তাহার তিন মাসের খোরাক মাত্র নিজের দেশ হইতে যোগাইতে পারে। বাকী নয়মাসের অধিকাংশই এই দেশ হইতে সরবরাহ করিতে হয়। দেশে যথেষ্ট পরিমাণ ধান চাউল জন্মিলেও মহাজনেরা এবং ব্যবসাদারেরা সে সব গুদাম জাত করিয়া উচ্চ মুল্যে বিক্রয় করিয়া বিদেশে রপ্তানী করে। সুদখোর মহাজন এবং ব্যবসাদারের প্রবল নিষ্পেষনে আর বর্তমানে সরকারী 'কনট্রোল' এ পড়িয়া দুর্ব্বল দরিদ্র তাহার অন্ন সংস্থান করিতে পারিতেছে না। ইংরাজের শোষণ লীলায় ইহারাই প্রধান পাণ্ডা। জাতীয় স্বাধীনতা বা গণতান্ত্রিক আত্মকর্তৃত্ব লাভ না করিতে পারিলে এই শোষণ ক্রিয়া বন্ধ করা যাইবে না। এই জাতীয় গণতান্ত্রিক আত্মকর্ত্তৃত্ব বা পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতবাসীকেই

স্বকীয় তপস্যা এবং ধর্মবলেই অর্জন করিতে হইবে। সুদীর্ঘ কালের অধর্মাচরণে জাতীয় কল্যাণ বলি দিয়াই ভারতের এই দুর্দশা। ভারতের ধনিক সম্প্রদায়, দেশের প্রাণ পল্লীকে এবং পল্লীর প্রাণ কৃষকদিগকে দলিত এবং বিধ্বস্ত করিতে শাসক সম্প্রদায়কে সাহায্য করার পাপেই এই নিদারুণ দুর্দশা! একদিকে ধনিক সম্প্রদায়ের ধর্মহীনতা, চরিত্রহীনতা, অমিতব্যয়িতা, প্রজাপীড়ন, প্রজার অর্থ-শোষন আদি পাপ ও অধর্ম; আর অন্যদিকে শ্রমিক সম্প্রদায়েরও দারুণ অধর্ম ও পাপ আছে। সুদখোর মহাজন ও ব্যবসাদারেরা এবং একটা বিদেশী বণিক সরকার বা স্বদেশী সাম্প্রদায়িক বণিক সরকার দরিদ্র শ্রমিকদিগকে নিষ্পেষিত করিতে পারিতেছে কারণ:—কৃষক ও শ্রমিক দিগের (১) চরিত্র হীনতা (২) শ্রমবিমুখতা (৩) বিলাস ব্যসন উৎসবাদিতে অমিতব্যয়িতা ও (৪) সঙ্ঘ শক্তির অভাব। জাতীয়পূর্ণ আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে হইলে ভিক্ষার ঝুলি ঘাড়ে লইলে হইবে না। বিদেশী কখনও করুণা পরবশ হইয়া আপনার ৮।৯ মাসের খাদ্য সংস্থানের বস্তুটী দান করিবে না। ভারত বাসীকে বাঁচিতে হইলে যাহারা অন্নসংস্থান কাড়িয়া লইতেছে তাহাদিগের নিকট হইতেই পুনরায় উহা কাড়িয়া লইতে হইবে। 'বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা' ভীরু কাপুরুষকে অন্নদান করেন না। ব্যক্তিগত ধর্মের ন্যায় সমষ্টিগত রাষ্ট্রগত ধর্মের উৎকর্ষ করিয়াই জাতীয় পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় ধর্মের প্রধান কর্ম সঙ্ঘশক্তির উদ্বোধন। কৃষকশ্রমিকে ও ধনিকে এবং সর্বজন-সাধারণে পূর্ণ সহযোগ। প্রথমেই আপনাদিগের মধ্যে সহযোগিতা বা Co-operation। তাহার পরেই শাসনকর্তাদিগের সহিত পূর্ণ অসহযোগিতা বা Non-co-operation এই দুইই সহভাবী বা অঙ্গাঙ্গী ভাবে বিজড়িত। নাগরিক শ্রমিকেরা পল্লীর শ্রমিক দিগের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা, সহধর্মিতা অবলম্বন না করিলে পল্লী

বোধন হইবে না। নাগরিক শ্রমিক সংখ্যায় অতি অল্প হইলেও তাহাদিগকে পল্লীর শ্রমিকদিগের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। ধনিকেরা যদি আপনাদিগের এবং সমগ্র জাতির কল্যাণ কামনা করেন, তবে জাতির মেরুদণ্ড যে শ্রমিক তাহাকেই বলশালী এবং বীর্যবান্ করিবেন। ধনিকদিগকে শ্রমিকদিগের সহিত সহযোগিতা করিতে হইলে সর্বাগ্রে আমলাতন্ত্রের সহিতেই ধনিকদিগের অসহিযোগিতা আরম্ভ করিতে হইবে। তাঁহারা যদি তাহা না পারেন বা না করেন, তবে শ্রমিক দিগকেই ধনিক এবং আমলাতন্ত্র উভয়ের সহিতই অসহযোগিতা আরম্ভ করিতে হইবে। এই শ্রমিক দিগের প্রধান সমস্যা অন্নসংস্থান। ধনিক সম্প্রদায়ের সর্ব প্রধান এবং সর্বপ্রথম কর্তব্য এই অন্নসংস্থান কার্যে শ্রমিকদিগকে ঐকান্তিক ভাবে সাহায্য করা। এই শ্রমিকদিগের মধ্যে আবার যাঁহারা কলকারখানাদিতে মুজুরী করেন তাঁহাদিগকে কলকারখানাদির ধনিক কর্তারা প্রত্যক্ষভাবেই সাহায্য করিতে পারেন। বাকী শ্রমিকের অধিকাংশই পল্লীবাসী কৃষক। এই কৃষক সম্প্রদায়ই প্রকৃত-পক্ষে সমগ্র জাতির অন্নদাতা, প্রাণরক্ষক। গো জাতির ধ্বংস হইলে যেমন কৃষিজীবী কৃষকের সর্বনাশ, তদ্রূপ কৃষকের ধ্বংস হইলেও সমগ্র জাতির ধ্বংস ও সর্বনাশ। অন্নসংস্থান অর্থে কৃষক সংরক্ষণই দাঁড়ায়। শিক্ষা ও দীক্ষা বলে এই কৃষকেরা যদি চরিত্রবান্, শ্রমশীল, মিতব্যয়ী এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তবে তাহাদিগের শক্তি দুর্জয় অমোঘ হইবে। এই জনগণের সংহতি শক্তি যে গণপতি উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত সিদ্ধিদাতা গণেশ হইবেন। এই জনগণমন অধিনায়কই ভারত ভাগ্য বিধাতা হইবেন। পল্লীবোধন যজ্ঞে এই গণপতির আহ্বানই প্রথমে প্রয়োজন। সমগ্র ভারতের এই কৃষক নেতার নিকট বণিক ও আমলাতন্ত্র উভয়কেই

নতজানু হইতে হইবে। জনগণের অভিযান সর্বদেশেই সুরু হইয়াছে। ভারতকেও, বঙ্গকেও, এই জয় যাত্রায় যোগদান করিতে হইবে। তাই কৃষকের উদ্বোধন সর্বাগ্রে বরণীয়। ভারতের শতকরা ৮৫ জন কৃষিজীবী অর্থাৎ প্রায় ৩৮-১/৪ কোটী লোক কৃষিজীবী। এই বিরাট্ মানব সমষ্টির ডাল ভাতের ব্যবস্থাই সর্বাগ্রে করণীয়। কিন্তু কে করিবে? বিদেশী বণিক রাজের নির্মম শোষণ হইতে মুশ্লিমলীগদের দেশী শোষণ তুল্যরূপেই চলিতেছে। মুশ্লিমলীগের মন্ত্রীগণের ও তৎপন্থীগণের হাতে বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরে মরিয়াছে পঞ্চাশ লক্ষ আর এই সাড়ে তিন বৎসরে উহা প্রায় তুইকোটীতে পরিণত হইয়াছে বা হইতে যাইতেছে। বর্তমান ভারতে এবং বিশেষভাবে পূর্ব বাংলার কৃষক কুলকে, 'চাষার দল'কে বাঁচাইতে কী হইতেছে উপায়? ৩৮-১/৪ কোটি লোকের অন্ন সমস্যা আজ রুদ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "আমাদের ভাত কই"?

২। পল্লীর অন্নদাতা কৃষকের 'মরণ কাঠি ও জীবন কাঠি'।

পল্লী মায়ের বুকের ধন, তাহার একমাত্র সম্বল বৃদ্ধের যষ্টি, কৃষক আজ রুগ্ন, জীর্ণ, ভগ্ন, প্রপীড়িত, পর্যুদস্ত। শস্য শ্যামলার শ্যামলকোলের শ্যামচাঁদ আজ রাহুগ্রস্ত, কালিয়নাগের বিষে সে আজ জর্জরিত; তাই আজ ভারতের এই দারুণ তুর্গতি, বিমলিন তুর্দশা। ভারতের শত করা ৮৫ জন লোক কৃষিজীবী। কৃষক কুল বিধ্বস্ত হওয়াতেই আজ দেশ অন্নহীন। পূর্বে প্রজা মনিবে একটা প্রাণের ডোর, প্রেমের বন্ধন ছিল। কৃষক প্রজা ধনী মনিবকে অবলম্বন করিয়া দায়ের সময় বাঁচিত। সে মনিব সম্প্রদায়ও আর নাই। ব্রিটিশ শোষণের ফলে তাহারাও প্রায় তিরোহিত। ইংরাজই সাক্ষ্য দিতেছেন। সার জন কেরী

বলেন:—"The proprietors of vast tracts of country, as far as the eye could reach, have shrivelled into tenants of mud huts and possessors of only a few cooking pots" অর্থাৎ:—যতদূর পর্যন্ত চক্ষু যায় ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট ভূখণ্ডের অধিস্বামী সকল মৃণ্ময় কুটীরের রাইয়তে এবং কয়েকখানি মাত্র রান্ধিবার বাসন কোসনের মালিক রূপে পরিণত হইয়াছে। মিঃ জন ব্রাইট পার্লিমেণ্টে পরিষ্কার বলেন "They are now either homeless wanderers or pensioners on the bounty of the stranger by whom their fortunes have been overthrown". যে বৈদেশিক কর্ত্তৃক তাহাদিগের ভাগ্য বিপর্যয় হইয়াছে সেই বৈদেশিকের দয়া প্রদত্ত পেনসন্ বা বৃত্তি ভোগীরূপে অথবা গৃহহীন 'ভবঘুরে' রূপে তাহারা এখন বর্তমান আছে। বান্ধার কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হোয়াইট বলিয়াছেন, "A very large number of lower classes of population clearly demonstrate by the poorness of their physique that they are habitually half starved....I think the government would be astonished to find how many Oudh peasants cultivate land without any bullock" নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীর খুব বৃহৎ সংখ্যাই তাহাদিগের শরীর গঠনের ক্ষীণতার দ্বারা পরিষ্কার রূপে প্রমাণ করে যে তাহারা স্বভাবতঃই অর্দ্ধভুক্ত… আমার বিবেচনায় অযোধ্যার কৃষকদিগের কত অধিক সংখ্যক যে কোনও বলদ ব্যতিরেকে জমি চাষ করে, তাহা দেখিলে গভর্ণমেণ্ট আশ্চর্যান্বিত হইবেন। গাজীপুরের মিঃ রোজ নামক এক কলেক্টর সাহেব বলিয়াছেন "As a rule a very large proportion (of the agriculturiets in a village) are

in debt." গ্রামের খুব বেশীর ভাগ কৃষকই যে ঋণজড়িত আছে ইহা একটী নিয়মে দাঁড়াইয়াছে। বেহার অঞ্চলের কৃষকদিগের কথা পাটনার এক কালেক্টর সাহেব বলেন "can take one full meal instead of two" অর্থাৎ দুইবেলার পরিবর্তে একবেলা মাত্র পূর্ণাহার পায়। রবার্ট নাইট তাঁহার "India before our time and since" গ্রন্থে বলেন যে ব্রিটিশ শাসন উড়িষ্যায় প্রবর্তিত হওয়ার পর হইতেই কৃষকদিগের ধানের গোলা সকল কমিয়া যাইতে লাগিল এবং এক্ষণে সে সমস্ত গোলার অস্তিত্ব পর্যন্ত নাই। পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব কমিশনার মিঃ এস. এস. থর্বর্ণ স্বীয় রিপোর্টে বলিয়াছিলেন—"In India a handful of foreigners rules the tens of millions and through action of these foreigners the peasant masses are now largely dependants of money lenders their former servants":—ভারতে মুষ্টিমেয় বিদেশী কোটী কোটী লোককে শাসন করিতেছে এবং এই বৈদেশিক দিগের কার্যফলে কৃষক জনসাধারণ তাহাদিগের পূর্বভৃত্য ঋণদাতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে। গুরগাঁও জেলার ডেপুটী কমিশনার মিঃ জে. আর. ম্যাকোনকি লেখেন :— "It is obvious that the supreme object in life for them is how to keep body and soul together and the struggle is an arduous one" ইহা স্পষ্ট যে তাহাদিগের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কেবল কি করিয়া জীবন ধারণ করা যায় এবং ইহা একটা কঠোর সংগ্রাম। অযোধ্যার কমিশনার মি. ডব্লিউ. সি. বেনেট 'Oudh Gazzetteer' এ ওই প্রদেশের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে বলেন :—"It is not till he has gone into these subjects ln detail that a man can fully appreciate how terribly thin the line is which divides large

masses of people from nakedness and starvation" যতক্ষণ পর্যন্ত না একটী লোক এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে গিয়াছে ততক্ষণ সে পূর্ণভাবে অবধারণ করিতে পারিবে না যে, যে রেখা নগ্নতা এবং অনাহার হইতে জনসাধারণের অধিকাংশকে বিভাগ করিয়াছে তাহা কত সূক্ষ্ম। জেমস্ মিল (বিখ্যাত দার্শনিকের পিতা) অযোধ্যা ও কর্ণাট সমন্ধে বলিয়াছিলেন " Under their dependence upon the British Goverment, it has been seen that the people of Oudh and Karnatic, two of the noblest provinces of India, were by misgovernment, plunged into a state of wretchedness with which no other part of India—hardly any part of earth, had anything to compare"—James Mill's History of British India, Bk VI, pp 51-52. তাহাদের ইংরাজ সরকারের অধীনতায় থাকায় দেখা গিয়াছে যে ভারতের দুইটি অত্যুৎকৃষ্ঠ প্রদেশ অযোধ্যা ও কর্ণাটের অধিবাসীবৃন্দ কুশাসনের ফলে এরূপ দুর্দশায় ডুবিয়াছে যে ভারতের বা পৃথিবীর কোন অংশের সহিত তাহার তুলনা হয় না; ঐশ্বর্য্যশালী অযোধ্যার সেই অর্থ ইংরাজ কর্তারা কেবল জুয়া খেলিয়া উড়াইয়াছেন। " Every Engish man in Oude was possessed of an independent and sovereign authority. They learned......to claim the revenue of lacs as their right though they could gamble away more than two lacs (I allude to a known fact) at a sitting".—Gleig's Life of Hastings, vol. 2, p.458 & India Reform Pamphlet No. 9, p. 26 (৩) অর্থাৎ অযোধ্যায় প্রত্যেক ইংরাজ স্বাধীন এবং রাজকীয় প্রভুত্ব সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদের অধিকার রূপে লক্ষ লক্ষ টাকা রাজস্ব দাবী করিতে তাঁহারা শিখিয়াছিলেন যদিও

এক বৈঠকে তাঁহারা দুই লক্ষাধিক মুদ্রা জুয়া খেলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেন (আমি একটি জানিত ঘটনার উল্লেখ করিতেছি (৩) এই রিফর্ম পুস্তিকা বিলাতের India Reform Soicety কর্ত্তক প্রকাশিত এবং ইহার কমিটিতে ৩৭ জন M. P. ছিলেন। ফয়জাবাদের কমিশনার মিঃ হ্যারিংটন ভূমি ও কৃষি বিভাগের ডিরেক্টারকে লেখেন, "My own belief after a good deal of study of the closely connected question of agricultural indebtedness, is that the impression ("That the greater portion of the people of India suffer from a daily insufficiency of food") is perfectly true as regards a varying but always considerable number throught the greater part of India."—(১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে Pioneer পত্রে Oudh Affairs প্রবন্ধে Mr. Harrington) কৃষি সম্বন্ধীয় ঋণের ধন সম্পর্কযুক্ত প্রশ্ন বহুল পরিমাণে জানার ফলে আমার বিশ্বাস এই যে, এই ধারণা (যে ভারতের অধিকাংশ লোক দৈনন্দিন অপর্য্যাপ্ত আহারে কষ্ট পায়) ভারতের অধিকাংশ অংশে মাঝে মাঝে এদিক ওদিক হইলেও সর্বদা বৎসরের অধিক অংশ সম্বন্ধে ইহা সম্পূর্ণ সত্য। মান্দ্রাজ কৃষি বিভাগের ডব্লিউ. আর. রবার্টসন বলিয়াছেন "The condition of agricultural labours in India is a disgrace to any country calling itself civilized" ভারতে কৃষক শ্রমিক দিগের অবস্থা সভ্যনামে খ্যাত যে কোনও দেশের পক্ষে অপমান জনক।

এই শোষণের প্রধান অস্ত্র রাজস্ব এবং টেক্স। "ArbAtrary taxation is plunder authorised by law. It is the support and essence of tyranny ; and has done more mischief to mankind, than those other three scourges from heaven,

famine, pestilence and the sword......we need only recollect that our country men in India, have in the space of five or six years, in virtue of this right, destroyed, starved and driven away more inhabitants from Bengal, than are to be found at present in all our umerican Colonies....This is no exaggeration, my Lords, but plain matter of fact collected by Mr. Hastings A speech published in 1774"—সত্যচরণ শাস্ত্রীর গ্রন্থাবলী (মহারাজ নন্দকুমার চরিত), ৫০১ পৃষ্ঠে উদ্ধৃত। যথেচ্ছ ট্যাক্স্ গ্রহণ, আইনের ক্ষমতায় লুণ্ঠন। যথেচ্ছাচারিতার ইহাই অবলম্বন এবং সার। উপর হইতে তিন অভিশাপ দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধ অপেক্ষা ইহা মানবজাতির অধিকতর ক্ষতি করিয়াছে। আমরা কেবল মাত্র ইহাই স্মরণ করা আবশ্যক বোধকরি যে, বর্তমানে আমাদের সমগ্র আমেরিকার উপনিবেশ সমূহে যাহা দেখা যায় তাহাপেক্ষা অধিকতর লোক সমূহকে আমাদের দেশবাসীগণ ভারতে পাঁচ ছয় বৎসর মধ্যে এই অধিকারের বলে ধ্বংস করিয়াছে, উপবাসী করিয়াছে এবং বিতাড়িত করিয়াছে। লর্ডগণ, ইহা অতিরঞ্জিত নহে; ইহা মিঃ হেষ্টিংস্ এর ১৭৭৪ এ প্রকাশিত বক্তৃতায় সংগৃহীত ঘটনার সরল বিষয়।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট পল্লীর বুক হইতে ধীরে ধীরে যে রক্ত মোক্ষণ করিয়াছেন তাহার প্রাণঘাতী ক্রিয়া ৫।৭ বৎসরে বা ১০।১২ বৎসরে সম্যক্ উপলব্ধি হয় নাই। একটা বিরাট্ দেশকে তিলে তিলে রক্তশূন্য করিয়া ("India must be bled white"-Lord Salisbury) তাহাকে জীয়ন্ত কবর দেওয়ার যে অমানুষিক নৃশংসতা, হিংস্রবর্বরতা এবং নিদারুণ নিষ্ঠুরতা আছে তাহার তুলনায় গজনীর মামুদ, নাদির শাহ, আহাম্মদ সাহ আব্দালী, তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতির সাময়িক

লুণ্ঠন বা বর্গীর হাঙ্গামা সিন্ধুর নিকট গোষ্পদ তুল্য। এই সব লুণ্ঠনকারী আসিয়া কিছুদিনের জন্য ধনশালী ব্যক্তিদিগকেই লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কৃষক সম্প্রদায় ইহাতে প্রায় কোন রূপই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। কিন্তু এই এক শত সত্তর বৎসর ধরিয়া যে নিত্য লুণ্ঠন লীলা, যে রক্তমোক্ষণ ক্রিয়া চলিতেছে, তাহার ইতিহাস মহামূর্খ ভারতীয় কৃষক জানিতেও পারিতেছে না। এইদিনে দুপুরে ডাকাতী'র এই 'Civilised dacoity'র হিসাব ও সহজে পাওয়ার উপায় নাই। মিঃ ব্রুক্স এডাম্‌স্ তাঁহার 'Law of Civilisation and Decay' গ্রন্থের ২৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "Possibly since the world began no investment has ever yielded the profit reaped fron the I'ndian plunder" জগৎ সৃষ্টি হইবার পর হইতে এ পর্যন্ত কোন কারবারই এত লভ্য প্রদান করে নাই যাহা ভারতীয় লুণ্ঠন হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

মুইর, ব্রুক্স্ এ্যাডাম্‌স্ এর বাক্যে বলিয়াছেন :—"But in the language of Brooks Adams, "the takings of Clive either for himself or for the government were nothing compared to the wholesale spoliation which followed his departure, when Bengal was surrendered a helplees prey to a myriad of greedy officials who 'were irresponsible and rapacious and who emptied the private hoards." —Muir : Making of British India (Manchester, 1915), p. 82. কিন্তু ব্রুক্স্ এ্যাডাম্‌স্ এর বাক্যে, ক্লাইভের নিজের জন্য বা সরকারের জন্য দখল সমূহ তাঁহার গমনের পর বহু পরিমিত লুণ্ঠনের তুলনায় কিছুই ছিল না, যখন বঙ্গদেশ সহায়হীন বস্তুরূপে অযুত ব্ধ কর্ম্মচারীর নিকট সমর্পিত হইয়াছিল,

যে কর্ম্মচারীরা দায়ীত্বহীন ও লুণ্ঠনকারী ছিল এবং যাহারা ব্যক্তিগত সঞ্চিত ধন সমস্ত শূন্য করিয়া ছিল।

মিঃ ডিগবী মহোদয় বলেন যে পলাশীর যুদ্ধের পর ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় সাতশত পঞ্চাশ কোটী টাকা হইতে দেড় হাজার কোটী টাকা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া কোম্পানীর 'উপরি পাওনা' বা ঘুষের পরিমাণও ঐ সময়ে কম ছিলনা। এক বাঙ্গলা দেশ হইতেই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কোটী টাকা 'উপরি পাওনা' আদায় করা হইয়াছিল। কোম্পানীর 'উপরি পাওনা'র ইতিহাসও চমৎকার। জি. ক্লার্ক. এম. এ. মহোদয় তাঁহার "British India and England's Responsibilities' গ্রন্থের ৭-৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "Nor was the Company in good repute at home, An enquiry was set on foot, and it was found that the company had devoted in one year £ 100, 000 to bribery. But the House of Commons stifled enquiry. The recipients of bribes were amongst the highest classes and the king himself was seen to have acccpted a large sum.

In the mean time and largely by the diplomacy of abase ment the Company throve. The home Government wanted money. Some at home, anxious to get the concern into their hands for a price, offered a bribe to the Government. The company staved off difficulty by offering a large bribe. They advanced £ 200,000 and so secured an extension of the charter to the year 1766." স্বদেশে ও কোম্পানীর সুনাম ছিল না। একটী অনুসন্ধান আরম্ভ হয় এবং দেখা যায় যে কোম্পানী এক বৎসরে পনর লক্ষ টাকা ঘুষ দান

করিয়াছেন কিন্তু 'হাউস অভ কমন্স্"...(বিলাতের সাধারণ সভা) অনুসন্ধান চাপিয়া রাখেন। উচ্চতম শ্রেণী সমূহের মধ্যেও ঘুষ খোরেরা ছিলেন এবং স্বয়ং রাজাকেও বহুপরিমাণ অর্থগ্রহণ করিতে দেখা যায়।

ইতিমধ্যে এবং অনেক পরিমাণে নীচতার ষড়যন্ত্রের দ্বারা কোম্পানী উন্নত হইতে লাগিল। ইংলণ্ড সরকার অর্থ চাহিতে লাগিলেন। স্বদেশে অনেকে এই কারবারটা মূল্য দিয়া নিজেদের হাতে পাইবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে ঘুষ দিতে চাহেন। কোম্পানী বিপুল ঘুষ দিয়া এই বিপদ ঠেকাইলেন। তাঁহারা ত্রিশলক্ষ টাকা অগ্রিম দিলেন এবং ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সনন্দ বর্দ্ধিত করিয়া লইলেন। ইহার ফলে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পাঁচ বৎসর পরে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বা বাঙ্গলা ১১৭৬ সালে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। বাঙ্গলা দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক এই দুর্ভিক্ষে মারা যায়। স্নেহ মমতা শূন্য হইয়া 'পোড়া পেটের দায়ে' পিতা মাতা সন্তানকে বিক্রয় করে, এমন কি নর মাংসে পর্যন্ত জঠর জ্বালা নিবারণ করে।

ইহার বিবরণ 'এ্যাবে রেয়ন্যালস্' এর ভাষাতেই দেই :—
" The unhappy Indians were every day perishing by thousands under this want of sustenance, without any means of help and without any resource, not being able to procure themslves the least nourishment. They were to be seen in their own villages, along the public ways, in the midst of our European colonies pale, meagre, fainting, emaciated, consumed by famine, some stretched on the ground in expectation of dying, others scarce able to drag themselves on to seek for

any nutriment, and throwing themselves at the feet of the Europeans, entreating them to make them as their slaves.

To this description, which makes humanity shudder, let us add other objects equally shocking ; let imagination enlarge upon them, if possible ; let us represent to ourselves infants deserted, some expiring on the breast of their mothers ; every where the dying and the dead mingled together, on all sides the groans of sorrow and the tears of despair ; and we shall have some faint idea of the horrible spectacle Bengal presented for the space of six weeks-

During this time the Ganges was covered with carcases ; the field and high ways were choked up with them, infectious vapours filled the air and diseases multiplied ; and one evil succeeding another, it was likely to happen,t hat the plague might have carried off the remaindər of the inhabitants of that unfortunate Kingdom. It appears by calculations pretty generally acknowledged, that the famine carried off a fourth part ; that is to say, about three millions.

But it is still more remarkable, and serves to characterise the gentleness, or rather the indolence, as well as moral as natural, of the natives, that amidst this terrible distress, such multitude of human creatures pressed by the most urgent of all necessities remained

in an absolute inactivity, and made no attempts whatever for their self-preservation. All the Europeans, specially the Engish, were possessed of magazines and even these were not touched, private houses were so too; no revolt, no massacre nor the least violence prevailed. The unhappy Indians resigned to despair continued themselves te the request of succour they did not obtain and peaceably waited the relief of death.

Let us now represent to ourselves any part of Europe afflicted by a similar calamity. What disorder! What fury! What atrocious acts! What crimes would ensue! How should we have seen among us Europeans, some contending for their food with their dagger in hand, some pursuing, some flying, and without remorse massacring one another! How should we have seen men at last turn their rage on themselves, tearing and devouring their own limbs, and, in the blindness of despair, trampling under foot all anthority, as well as every sentiment of nature and reason!"—Abbe Raynals, History of East and West Indies, Translated from the Fr. by J. Justamond, M. A., Vol. I. Bk III pp. 460-462 (3rd Edition, 1777).

এই খাদ্য সামগ্রীর অভাবে কোনও সাহায্যের উপায় না থাকায় এবং কোনও সংস্থান ব্যতিরেকে, নিজেদের জন্য অতীব সামান্য মাত্র পুষ্টিজনক খাদ্যাদি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া এই অসুখী ভারতীয়গণ প্রতিদিন হাজারে হাজারে মরিতেছিল। তাহাদিগকে

দেখা যাইতেছিল তাহাদের নিজ গ্রাম সমূহে, সাধারণ পথের উপর দিয়া, আমাদের ইউরোপীয় উপনিবেশ সমূহের মধ্যে—বিবর্ণ, ক্ষীণ, মূর্ছাপন্ন, অস্থিচর্মাবশিষ্ট, দুর্ভিক্ষদ্বারা গ্রস্ত; মৃত্যুর প্রতীক্ষায় কেহ মাটির উপর বিস্তৃত, অপর কেহ কোনও খাদ্য সামগ্রীর অনুসন্ধানে কোনও ক্রমে নিজদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে এবং ইউরোপীয়-গণের পায়ের উপর আপনাদিগকে ফেলিয়া তাহাদিগকে তাঁহাদের ক্রীতদাস করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

এই বর্ণনার সহিত, যাহা মনুষ্যত্বকে শিহরিত করে, আমরা তুল্যভাবে ভয়ানক অন্যান্য বিষয় সমূহও যোগ করিতে পারি; যদি সম্ভব হয়, কল্পনাকে ইহার উপর প্রসারিত করা যাক; আমাদের কাছে আমাদেরই উপস্থাপিত করা যাক্—শিশুগণ পরিত্যক্ত, কেহ কেহ তাহাদের মাতার বুকের উপর মরিতেছে; সর্বস্থলে মরণাপন্ন ও মৃত একত্র মিশ্রিত, সর্বদিকে দুঃখের আর্তনাদ আর হতাশার চক্ষুজল; এই ভাবে আমরা কিছু অস্পষ্ট ধারণা পাইব ছয় সপ্তাহ ধরিয়া বাঙ্গলা যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখাইয়াছে।

এই সময়ের মধ্যে গঙ্গা শবসমূহে আচ্ছাদিত হইয়াছিল; ক্ষেত ও বিস্তৃত পথসমূহ তাহাদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সংক্রামক বাষ্প সমূহে আকাশ ভরা, রোগ সমূহ বহু বর্ধিত; আর এক অনিষ্টের পরে আর এক অনিষ্ট আসিয়া, ইহা হয়তো ঘটিতে পারিত যে, প্লেগ সেই হতভাগ্য রাজ্যে অবশিষ্ট অধিবাসীগণকে মারিয়া ফেলিত। যে গণনা বেশ সাধারণত স্বীকৃত, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে ঐ দুর্ভিক্ষে চতুর্থাংশ লোক মরিয়া যায় অর্থাৎ প্রায় ৩০ লক্ষ।

কিন্তু ইহা আরও অধিকতর আশ্চর্য এবং ইহা দেশবাসীদের নম্রতা অথবা জড়তা এবং নৈতিক ও স্বাভাবিক অবস্থার বিশেষত্বরূপে কার্য করে যে, এই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার মধ্যেও এই বিরাট সংখ্যক মনুষ্যনামধারী জন্তুগণ, সকল প্রয়োজন অপেক্ষা অত্যধিক প্রয়োজনীয়

চাপেও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিল এবং তাহাদের আত্মরক্ষার কোনও চেষ্টা পর্যন্ত করে নাই! সমস্ত ইউরোপীয় গণের এবং বিশেষত ইংরাজগণের ভাণ্ডার সমূহ ছিল। কিন্তু এ সমস্তও তাহারা স্পর্শ করে নাই; ব্যক্তিগত গৃহসমূহও এইরূপ ছিল; কোনও বিদ্রোহ, কোনও হত্যা, কিছুমাত্র হিংসা চলিত থাকে নাই। অসুখী ভারতীয়েরা হতাশার বশবর্তী হইয়া যে সাহায্য তাহারা পাইয়াছিলনা সেই সাহায্যের অনুরোধে আপনাদিগকে চালাইতেছিল এবং শান্তভাবে মৃত্যুর উপশমের অপেক্ষা করিতেছিল।

এখন আমাদের কাছে অনুরূপ বিষম বিপদে ক্লিষ্ঠ ইউরোপের কোনও অংশের বিষয় উপস্থিত করি। কী বিশৃঙ্খলা! কী হিংসা! কী নিষ্ঠুর কর্মসমূহ! কী অত্যাচার সমূহ ঘটিত! আমাদের ইউরোপীয়গণের মধ্যে আমরা কী ভাবে দেখিতাম—কেহ ছোরা হস্তে বিবাদ করিতেছে তাহাদের খাদ্যের জন্য, কেহ পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে, কেহ পলাইতেছে এবং অনুতাপ হীন হইয়া পরস্পরকে হত্যা করিতেছে! আমরা কী ভাবে দেখিতাম যে অবশেষে মনুষ্যগণ আপনাদের উপরেই তাহাদের রোষ পরিবর্তিত করিতেছে, তাহাদের আপন আপন অঙ্গসমূহ ছিঁড়িয়া, গ্রাস করিয়া, এবং হতাশার অন্ধতায় সমস্ত শাসন, এমনকি স্বভাবের ও যুক্তির প্রত্যেক বোধ পদদলিত করিয়া! পৌনে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের এই দুর্ভিক্ষের মর্ম্মান্তিক দৃশ্য আঁকিয়াছেন—নিরপেক্ষ এক ফরাসী ঐতিহাসিক ফরাসী ভাষায়। কিন্তু আজ সেই দুর্ভিক্ষ নিত্য ধ্বংসলীলা চালাইতেছে অফুরন্ত যাত্রায়। দুর্ভিক্ষের এতো মৃত্যু খেলা রঙ্গে ভারতবাসী শান্ত, নিষ্ক্রিয়, প্রতিরোধ বিহীন। ফরাসী ঐতিহাসিক ইহাকে বলিয়াছেন মৃদুভাষায় "indolence" আলস্য, জড়তা! উহা প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যত্ব, পশুত্ব অপেক্ষাও নিম্নস্তরের প্রস্তর জড়ত্ব, প্রস্তরীভূত কঙ্কালের জড়ত্ব। ভারতবাসীর এই শান্তি,

"Peace of the grave", কবরের শান্তি, শ্মশান-যাত্রীর নিস্তব্ধ মৃত্যুর চিরশান্তির পূর্ব মুহূর্ত। "মার্কিন সামরিক তথ্য বিভাগের দপ্তরের মতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এককোটি চল্লিশ লক্ষ সৈন্য নিহত হয়েছেন। বেসামরিক অধিবাসী মারা গেছেন দু' কোটিরও বেশী।" [আঃ বাঃ পঃ (দৈঃ,) ৭ পৃঃ, ৩।৭।১৩৫৩] বিশ্বব্যাপী একটা সার্বিক-মহাযুদ্ধে মারা গেল প্রায় ছয় বৎসর ধরিয়া সাড়ে তিন কোটী লোক প্রায়। আর ১৩৫০ এর 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' হইতে ১৩৫৩ সালের তেপ্পান্নর মন্বন্তর পর্যন্ত সাড়ে তিন বৎসরে সাড়ে তিন কোটীরও উপরে যে কতো ভারতবাসী পোড়া পেটের দায়ে পোকা মাকড়ের মতো মরিয়াছে এবং আজিও মরিতেছে তাহার সঠিক সংখ্যা পর্য্যন্ত কারনাজিতে কারসাজিতে মিথ্যার মায়ায় হইয়া আছে আচ্ছন্ন। এক ১৩৫৩ তেই দুর্ভিক্ষে মরিয়াছিল ৫০ লক্ষ। যাহারাও বাঁচিয়া আছে তাহারাও কঙ্কাল সার। তবুও এই কঙ্কাল দলের চোখে নাই বিপ্লবের আগুণ, মুখে নাই অতি ভোজী পেটুকদের প্রয়োজনাতিরিক্ত গ্রাস কাড়িয়া লইবার কঠিন সঙ্কল্প, বুকে নাই জীবন সংগ্রামে বাঁচিয়া থাকিবার দুর্জয় সাহস মরিয়া হইয়া!

দয়াময়ী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হস্তেও ভারত রাজদণ্ড আসিয়াছিল। কিন্তু" ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে"। কোম্পানীর আমলে প্রজারা দেড় কোটী টাকা রাজস্ব দিতে বাধ্য হইত; কিন্তু ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রজাদিগকে ২কোটী ৩লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে হইল। ইহার ফলে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এক বিদ্রোহ। বিদ্রোহের কারণ তদন্ত কমিশনই বলেন "Extravagantly heavy assessments" অর্থাৎ অপরিমিত রাজস্ব বৃদ্ধি। এক এক বন্দোবস্তের সময় এই রাজস্ব হার ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ২৭,৭৮১ খানি পল্লীর মধ্যে ১৩,৩৬৯ খানি পল্লীর নূতন বন্দোবস্ত করা হয়। তাহার কলে তাহাদের রাজস্ব এক কোটী চুয়াল্লিশ লক্ষ

হইতে এককোটী অষ্টাশী লক্ষে বর্ধিত হইল। ইহাদিগের মধ্যে অনেক গুলি পল্লী দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত থাকিলেও তাহাদের মধ্যে ৭৮ খানি পল্লীর নূতন বন্দোবস্ত করিয়া ১,০৩, ৫৩০ টাকার পরিবর্তে ১,৩৩,৫৯০ টাকা রাজস্ব বর্ধিত করা হইল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মহামতি গোখ্‌লে বড়লাটের ব্যাবস্থাপক সভায় বলেন যে তুলনায় ইউরোপীয় কৃষক দিগের অপেক্ষা ভারতীয় কৃষকদিগকে অধিকতর রাজস্ব দিতে হয়। দুর্দশায় মগ্নবুক, দারিদ্র্যে ভগ্নপ্রাণ ভারতীয় কৃষকদিগকে কেবলমাত্র রাজস্ব বাবদেই শতকরা ১৫৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা দিতে হয়। ইহা ছাড়া পথকর, জলকর, 'পাব্লিক ওয়ার্কস্‌ সেস্' চৌকীদারী ট্যাক্স, ষ্ট্যাম্পকর, লবণ কর, বস্ত্রকর প্রভৃতি বাবদে কতরকম যে 'direct' প্রত্যক্ষ এবং 'indirect' পরোক্ষ ট্যাক্স্‌ দিতে হয় তাহার হিসাব নাই। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে বিলাতের একস্থানে বক্তৃতাকালে ৺রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় দেখান যে ভারতবাসীকে জন প্রতি বার্ষিক ৩।০ টাকা কর দিতে হয়। ইংলণ্ডে এরূপ আয়ে ১৮০-র বেশী দিতে হয় না। ইংলণ্ডের আয়ের অনুপাতে কর ধার্য ঠিক ঠিক হইয়াছে ধরিলে ইংলণ্ডের এবং অন্যান্য কয়েকটী দেশের তুলনায় ভারতের করহার কত বেশী তাহা নিম্নের তালিকাতেই প্রস্ফুট হইবে।

দেশ	কর যাহা আছে	কর যাহা হওয়া উচিত
ইংলণ্ড	১৯·৬	১৯·৬
জার্মাণী	১২·২	১৩·২৬
ফ্রান্স্‌	১৩·০	১৭·১২
আমেরিকা	৭·০৮	২৩·১১
ভারতবর্ষ	৪·৬	১·০৭

আর অন্যান্য দেশের কিছুকাল পূর্ব্বের ভূমি রাজস্বের তালিকাও দেখুন—ইংলণ্ড—৮।৴০, অষ্ট্রীয়া—৪৸৴০, জার্মানী—৩৲,

হল্যাণ্ড—২৸৴, ফ্রান্স—৪৸৴, ইটালী— ৭৲, বেলজিয়াম—২৸৴ ভারতবর্ষের সাধারণ রাজস্ব ইংরাজ আমলে বৎসরে প্রায় ২২৫ কোটী টাকা হইতে, ২৬০ কোটী টাকা ছিল। ইহার শতকরা ৯০ ভাগ নিম্নের দফা হইতে পাওয়া যাইত:—কাস্টম (শুল্ক)—শতকরা ২৫, জমির কর শতকরা ১৫, আয় কর শতকরা ৮, লবণ আবগারী ও ষ্ট্যাম্প কর শতকরা ১৮, আর রেলওয়ে, বন ও সেচে শতকরা ২২। এই সব রাজস্বে ভারতীয় করদাতা দিয়াছে প্রায় ৭৲ অর্থাৎ তাহার আয়ের ৬ হইতে ৮ অংশ। ইংলণ্ডে এই করভার সাধারণত শতকরা ২০ ভাগ আয়ের। ইংরাজদের সাধারণ আয় গড়পড়তায় ১১০০৲ হইতে ১২০০৲। এই বেশী আয়ের ৫।৬ অংশ দেওয়া অপেক্ষা ৫০৲।৬০৲ আয়ের ৬।৮ অংশ দেওয়া যে কতো বড় শক্ত ও গুরুভার তাহা প্রায় নিত্য দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ভারতবাসী হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে। তাই একজন লেখক বলিয়াছেন, "It is not melodramatic exaggeration to say that the revenues of India are wrong out of hungry peasants and workers—The Problem of India. by (Dr) K. S. Shelvanker (1940). p. 69. এরূপ বলা উদ্দীপক (গীতিনাটকীয়) অতিশয়োক্তি নহে যে, ভারতের রাজস্ব ক্ষুধিত কৃষককুল ও শ্রমিক কুলের নিকট হইতে বলপূর্বক লওয়া হয়। এই স্বাধীনতার যুগেও করভার বাড়িয়াই চলিয়াছে। করভার বাড়িয়াই চলিল যদি, তবে পল্লীবাসী সে স্বাধীনতার সুখ, শান্তি কতটুকুই বা জীবন ক্ষেত্রে আস্বাদন করিবে? ওসব বিদেশের ভূমি রাজস্বের মধ্যেই জলকর, পুর্ত্তকর, চৌকীদারী কর, ষ্ট্যাম্প কর প্রভৃতিও আছে। এই সমস্তের জন্য আর পৃথক কর দিতে হয় না। কিন্তু দারিদ্র্য প্রপীড়িত ভারতবর্ষের ব্যবস্থা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কৃপায় অন্যরূপ ছিল। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে বড়লাটের কৌন্সিলের মেম্বর স্যার উলিয়ম হাণ্টার ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন

"The Government assesment does not leave enough food to the cultivator himself and his family through out the year" গভর্ণমেণ্টের নির্ধারিত কর সারা বৎসর ধরিয়া কৃষকের নিজের এবং তাহার পরিবার বর্গের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য রাখে না। " Half the gross produce of the soil is demanded by Government..it keeps the people, even in favourable years, in a state of abject penury.........................Even Bengal is taxed highly,"—Bishop Heber's Memoirs and Corresprondence, by his widow, Vol. II, Pp. 413, 414—quoted in 'Prosperous' British India by William Digby, Pp.50, 51. গভর্ণমেণ্ট মাটী হইতে মোট উৎপন্নের অর্দ্ধেক চাহিলেন ....অনুকূল বৎসর সমূহেও ইহা জনগণকে জঘন্য দারিদ্র্যের অবস্থায় রাখে। এমন কি বাংলাও অত্যধিক কর ভারাক্রান্ত। মিঃ রিকার্ডস্ (Rickards) সাক্ষ্য দিয়াছেন যে অনেক ক্ষেত্রে জমির উৎপন্ন দ্রব্যের চাইতেও রাজস্ব বেশী "the revenue assessed upon certain lands has actually exceeded the gross produce") এবং জমি বিক্রয় মূল্যহীন "The lands is..destitute of saleable value"—রিকার্ডস্ আরও বলিয়াছেন যে এইরূপ ট্যাক্স পুলিশ ও শাসন প্রণালীর চাপে পড়িয়া ভারতবাসীর অর্থশালী বা উন্নত হইবার কোন আশাই নাই।—('Prosperous British India,' William Digby, p. 59) ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ জে. র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ড (J. Ramsay Mcdonald) তাঁহার 'The Awakening of India" গ্রন্থের ১৪২-১৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "Our (England's) burden at home is about £ 3 per head; our income £ 40 per head. The burden upon the

British India is 1s 10⅔d per head whilst his averag annual income is not more than £2" বিলাতে আমাদিগের বোঝা (কর) মাথা প্রতি প্রায় ১৫৲ টাকা এবং আমাদিগের আয় মাথা প্রতি ৬০০৲ টাকা। ব্রিটিশ ভারতের উপর বোঝা (কর) মাথা প্রতি ১৲ টাকা ৬⅔ আনা। অথচ গড়পতায় তাহার বাৎসরিক আয় ৩০৲ টাকার বেশী নহে। এই ভূমি রাজস্ব ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এক একবার সেটেল-মেণ্টের জরিপ হইতেছে আর রাজস্ব বাড়িতেছে; আর সঙ্গে সঙ্গে জরিপের দরুণ খরচটা কৃষকাদি সকলের ঘাড়ে চাপাইয়া প্রকারান্তরে অর্থ শোষণের পথ পরিষ্কৃত হইতেছে। বাঙ্গলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য কর্তারা রাজস্ব বড় বাড়াইতে পারিতেন না। কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ইহা বাড়িয়াই চলিয়াছে। বাঙ্গলাতেও প্রকারান্তরে কর্তারা যে অর্থ শোষণ করিতেছেন তাহার নাম করণ 'রোড্‌সেস,' 'পাব্লিকওয়ার্কস্‌সেস্‌,' 'ফেমিন রিলিফ ফাণ্ড' ইত্যাদি করিলেও তাহারা রাজস্বেরই ছোট ভাই। আবার 'এডুকেশন সেস্‌' বলিয়া নূতন করও বসিয়াছে। মূর্খ বজ্জাতদিগকে খুব ভাল রকম 'শিক্ষা' দিতে হইবে। শিক্ষাকরে আচ্ছা শিক্ষা ক'রে নাও। শাসন ও শোষণের কুটিল কারসাজি এই পথকর পূর্ত্তকর এবং দুর্ভিক্ষ নিবারক কর এবং শিক্ষাকর। নিত্য দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত 'মড়া' প্রজার উপর এই 'খাঁড়াব ঘা' এই মরা দেশে, এই লক্ষ্মীছাড়া গোলামের গোলাম ভারতবাসীর উপরই সাজে। ব্রিটিশ সিংহ বেশ বুঝিয়াছিলেন যে এগুলি ভেড়ার দল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাঙ্গলার রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বিধান করেন যে এই নির্দ্দিষ্ট রাজ কর আর কোনও কারণে কোনওরূপে বর্দ্ধিত হইবে না। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর কর্তাদের অর্থাভাব হওয়ায় তাঁহারা ফন্দি অাঁটিলেন যে পল্লীর পথ নির্মাণ করিবার

জন্য 'রোড্ সেস্' বা পথকর ভূমি রাজস্বের উপর স্থাপিত হউক। সেস্ কমিটি নামক এক কমিটীর হাতে ইহার ব্যয়ভার অর্পণ করা হয়। কিন্তু ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট সার এসলি ইডেন ইহার সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের করণীয় আরও কতকগুলি কার্য্যভার ইহার স্কন্ধে সমর্পন করিয়া 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাইলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ছোটলাট সার রিভার্স টমসন আবার সেস কমিটী তুলিয়া দিয়া বর্তমান 'ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড' গঠন করিয়া তাহার হাতে এই 'রোড সেসে'র টাকা দিয়া তাহার নাম 'ডিষ্ট্রীক্ট ফাণ্ড' রাখিলেন। যখন এই রোড সেস বা পথকর প্রথম ধরা হয় তখন বঙ্গবাসী ইহার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছিল যে ইহাতে বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হইবে। তদানীন্তন কালের ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্থসচিব মিঃ জেমস্ উইলিয়ম, বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার আরস্কি্ন পেরি, বাঙ্গলার হাইকোর্টের প্রধান বিচারক সার বার্ণেস পিকক প্রভৃতিও এই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত সচিব ডিউক অব আর্গাইল পল্লীবাসীকে বলিলেন যে এই পথকর পল্লীবাসীর সম্মতিক্রমেই ব্যয় করা হইবে এবং পল্লীর রাস্তা, পথ, জলাশয়ের জন্যই সম্পূর্ণ ব্যয় করা হইবে। কিন্তু কিছুকাল পরে এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে মিঃ রিসলি পরিষ্কার বলিলেন যে পথকর বলিয়া পৃথক কোন অর্থ নাই। ব্যস্! তারপরে এই পথকর দিয়া ডিষ্ট্রীক্ট জেলার উপর, সহরের উপর রাজপথ, হাঁসপাতাল, স্কুল, দুর্ভিক্ষপ্রতিকার প্রভৃতি সব প্রতিকার কার্যে ব্যয় করিতে লাগিলেন এবং প্রকারান্তরে সহরের মিউনিসিপালিটীর সাহায্য করিতে লাগিলেন, আর পল্লীবাসী রহিল "তুমি যে তিমিরে; তুমি সে তিমিরে"। পল্লীর অর্থ শোষণ করিয়া নগর সহরের রাস্তা ঘাট জলাশয় হইতে চলিল, আর পল্লী রাস্তার অভাবে নিবিড় জঙ্গলেয় মধ্য

দিয়াই বন্য পশুর ন্যায় পথ করিতে লাগিল এবং নির্মল পানীয় জলের অভাবে কদর্য দূষিত জল পান করিয়া, কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, উদরাময় প্রভৃতি রোগে পোকামাকড়ের মতো দেহত্যাগ করিয়া যমরাজার দেশে তীর্থ যাত্রা করিল। আরা ও ভাগলপুর সহরে নির্মল জলের প্রয়োজন; বঙ্গেশ্বর স্যার চার্লস ইলিয়ট পথকর হইতে তাহাদিগকে দুই লক্ষ টাকা দিলেন। বঙ্গের এক ছোটলাট এণ্ড্রু ফ্রেজার মুঙ্গের ও বাখরগঞ্জের অধিবাসীদিগকে পথকরের টাকা যথেচ্ছ ব্যয় করিতে পরামর্শ দিলেন। তার পরে পথকরের টাকা লইয়া দুর্ভিক্ষ নিবারক ফাণ্ড হইল। কিন্তু দুর্ভিক্ষ কালে প্রজারা পল্লীবাসীরা সে টাকা পাইল না। এই রোড্ সেস্ এখন ক্রমশঃ এক এক সেটেলমেণ্টের জরীপের সঙ্গে বাড়িয়া বিপুলায়তন ধারণ করিয়াছে। এখন এই পথকরের দৌরাত্মে বাঙ্গলার পল্লীবাসীর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, জাইগীর প্রভৃতি নিষ্কর ভূমির উপরও এত পথকর বসিয়াছে যে তাহা প্রায় ঐ ভূমির খাজনার তুল্যই হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় দেশীয় নৃপতিদিগের (Native states) রাজ্যেও করভার ব্রিটিশ ভারতের করভার অপেক্ষা কম। ইহার সাক্ষ্য ভারত গবর্ণমেণ্টের সংবাদ বিভাগের কর্তা (Director of Information ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) Mr Rush Brook Williams ও দিয়াছেন। (১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জুলাইমাসের 'এসিয়াটিক রিভিউ' পত্র দ্রষ্টব্য।)

এইরূপ ভাবে করভারে প্রপীড়িত করিলে যে শেষে গবর্ণমেণ্টেই দেউলে' হইয়া পড়েন তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত অনেকেই বলেন। সম্রাট ফ্রেডারিক দি গ্রেট (Frederick the Great) এই অনুযায়ী মত প্রকাশ করিতেন এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। চীন দেশের বিখ্যাত

মনীষী লাউৎ-সে (Lao-tse) খৃষ্টপূর্ব ৫০০ বা ৬০০ বৎসর পূর্বে এই তথ্য প্রণিধান করিয়া চীন দেশকে সমুন্নত করেন। চীনের পূর্বতন হান বংশের সম্রাট ওয়েন এবং পরবর্তী স্থইবংশের সম্রাট ওয়েনও এই নীতি অবলম্বন করেন। রসকার (Roscker) তাহার 'ফাইনেন্জ ওয়াইজেন শ্চাটে' (Finanz wissenschaft) লাউৎসের মত উধৃত করিয়া এইরূপ বলেন "The state will bankrupt itself if it adopts the policy of saying 'I need so much, ; raise the money ; rather than 'I have so much and can therefore spend so much" "আমার এত আছে স্থতরাং এত ব্যয় করিতে পারি" ইহা না বলিয়া রাজা যদি বলে যে "আমার এত প্রয়োজন ; এই টাকা উঠাও" তবে রাজ্য নিজেই দেউলিয়া হইবে। লাউ-ৎসে আরও বলেন যে "The people starve because, those in authority devour too many taxes"—প্রজারা না খাইয়া মরে, কারণ, কর্তৃপক্ষরা অত্যধিক কর গ্রাস করেন। ইতিহাসে ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র ব্যক্তি সমষ্টি যখন অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিকে পীড়ন করিয়া অন্যায়ভাবে তাহার ধন হরণ করে তখন তাহাকে চোর বা ডাকাত বলে। অর্থনীতি শাস্ত্র বা রাজনীতি শাস্ত্র নানা নামকরণ করিলেও জনসাধারণের কাছে অত্যধিক করভার রাষ্ট্রীয় চুরি বা দিনে দুপুরে ডাকাতি ছাড়া আর কিছুই নহে। রাষ্ট্রীয় কর্তাদের দাবী দাওয়া, দলীয় শক্তি বৃদ্ধির যুপকাঠে বা কসাই খানায় প্রজার অর্থনীতি যে ভাবে বলিদান করা হয়, তাহা অর্থনীতিবিদেরা অর্থনীতির গবেষণা ও রহস্যোদ্ঘাটন বলিয়া ব্যখ্যা করিলেও মূলে তাহা চরিত্র ও শীলনৈতিক (ethical)। একটা অমিতব্যয়ী ও দেউলিয়া ব্যক্তি তাহার আয় অনুসারে ব্যয় না করিয়া যখন ব্যয় করিয়া পরে নানা উপায়ে সেই ব্যয় পূরণ করিবার করে চেষ্টা, তখন তাহাকে বাধ্য

হইয়া অনেক অন্যায় ও গর্হিত নৈতিক চরিত্র হীনতার কাজ করিতে হয়। একটা রাষ্ট্রীয় প্রভুদল বা সরকারী দল এবং তাহার বিরোধী দলকেও এইরূপ অত্যধিক ব্যয় বাহুল্যে আয়ের অন্যায়, অনৈতিক ও প্রজা স্বার্থ বিরোধী বিপথে চলিতে বাধ্য হইতে হয়। ভারতীয় রাজস্ব প্রণালী ইংরাজের আমলেও এই দুর্নীতির প্রচ্ছন্ন প্রণালীতে চলিয়াছে এবং বর্ত্তমানেও ভারত রাষ্ট্রের ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের আমলে তাহা অব্যাহত চলিতেছে, কেবল মাত্র তাহার মুখোস পরিবর্তিত হইয়াছে। "History has a hundred names fcr the deed that plain man know as robbery.

The primary function of the Indian revenue system is to find the money to meet these Claimcs"—The Problem of India (Dr) K. S. Shelvankar (1940) p. 67. সাধারণ লোকে যাহাকে দস্যুবৃত্তি বলে সেই কাজের শত নাম ইতিহাসে আছে। ভারতীয় রাজস্ব প্রণালীর প্রাথমিক কাজই হইতেছে এই সমস্ত দাওয়া পূরণের জন্য টাকার পথ বাহির করা। তাই যুক্ত বাংলায় দেখিলাম মুস্লিম নেতৃত্বের আমলে দশ বৎসরে ১৪৩ কোটি টাকার হিসাব মিলিতেছে না। এবং এই টাকা কোথায় কি ভাবে ব্যয় হইল তাহার হিসাব নাই। Ethical Codes বা শীল-নীতির নিয়ম কানুনে—ইহাকে কি বলে? দস্যুবৃত্তি, Black market বা চোরা কারবার কাহাকে বলে? আসল কথা আয় যাহা আছে তাহার দ্বারা খরচ চালানর ব্যবস্থা না করিলে দস্যুবৃত্তি করিয়া কালা বাজারে বা চোরা কারবারে অনেক ভাল মানুষ বা ভাল দল বা ভাল রাষ্ট্রীয় কর্তাদেরও জড়াইয়া পড়িয়া দুর্নীতি পরায়ণ হইতে হয়। কে তাহাদিগকে শাসন করিবে? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় অত্যধিক কর ভার প্রপীড়িত প্রজাগণই, জনগণই সে শাসন ভার গ্রহণ করে। যে জাতি, যে সম্প্রদায়, যে রাষ্ট্রীয় শাসক দলের পশ্চাতে যতো বেশী

ন্যায়বল, নৈতিক শক্তি ও চারিত্রিক ক্ষমতা আছে তাহা ততোই শক্তিশালী, দীর্ঘজীবী হয়। প্রজার উপর অত্যধিক করভার বসান মানে রাষ্ট্রের দেউলিয়া হইবার পথে অধঃপতন। পূর্ববঙ্গের মুস্লিমলীগ রাষ্ট্র নায়কগণ তাহা হইতে কি সময় থাকিতে সাবধান হইবেন? লাউৎসের বাণীতে কি কর্ণপাত করিবেন? লাউৎসের বাণীর ন্যায় রামায়ণ, মহাভারত এবং অনেক স্মৃতি গ্রন্থে অনুরূপ বাণীর প্রতিধ্বনি ভুরি ভুরি আছে। হিন্দুযুগে উক্ত নীতি সম্যক্ প্রতিপালিত হওয়ার ফলেই হিন্দু জাতি ঐশ্বর্য মহিমার শিখরে উন্নত হইতে সক্ষম হয়েন। মুঘল আমলেও সম্রাট বাবর হইতে সম্রাট সাহজাহন পর্যন্ত সকলেই এই নীতির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। এই কারণেই মুঘল সম্রাটগণ অসাধরণ ঐশ্বর্যশালী হইয়াছিলেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই আয় অনুযায়ী ব্যয় নীতি পদদলিত করার ফলেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হইয়া ওঠে। আধুনিক স্বাধীন দেশগুলিতেও এই নীতি কতক পরিমাণে প্রতিপালিত হয়। ইংলণ্ডের ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয় যে যখনই প্রজাগণ অতিরিক্ত করভারে প্রপীড়িত হইয়াছে, তখনই তাহারা বিদ্রোহের জয় ধ্বজা উড়াইয়াছে। চায়ের উপর কর বসাইতে যাইয়া ইংলণ্ডকে আমেরিকা হারাইতে হইয়াছে। ১৭৭৬ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখের আমেরিকার স্বাধীনতার জয় ঘোষণা (Declaration of American Independence) অঙ্গুলি সঙ্কেতে এই বার্তাই প্রচার করিতেছে। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত ফরাসী বিদ্রোহও (French Revolution) এই ইঙ্গিত দান করে। বাঙ্গলার নীলকর বিদ্রোহ নীলকরের বিরুদ্ধে এক সফল অভিযান। তাহাও এই ইঙ্গিত দান করে। সব দেশেই এই ইঙ্গিত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর সমগ্র জাতির ঐতিহাসিক ইঙ্গিত দেখিয়াও ভ্রান্ত ইংরাজ সরকার সময়ে সাবধান হন নাই, তাই তাঁহাদিগকে ভারত সাম্রাজ্য

ত্যাগ করিতে হল। আর বাংলার মুশ্লিমলীগ শাসন কর্তারাও কি করিতেছেন, খোদ ইংলণ্ডকেই পাকিস্তানের ও ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে তাঁহারা যেন ইহা বিশেষভাবে প্রাণিধান করেন। আর কংগ্রেস শাসন কর্ত্তাদের আমলেও স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রে, এবং পাকিস্তানেও এই করভার আদো কমেত নাই-ই বরং বাড়িয়াছে অত্যধিক। পূর্ব পাকিস্তানে বা পূর্ববঙ্গে করভার যেরূপ অত্যধিক বাড়িতেছে তাহাতে তাহাকেও এক বৈপ্লবিক প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হইবে।

এই সব করের উপর কর্তারা আবার "গোদের উপর বিষফোট" এর ব্যবস্থা করিলেন। কর্তারা লম্বা গলায় প্রচার করিলেন খালনালা কাটিয়া চাষবাসের সুবিধার জন্য জল নির্গমন করাইয়া স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পূর্তকর স্থাপিত হউক। "Let there be light and there was light" (আলো হউক অমনি আলো হইল) অমনি পূর্তকরস্থাপিত হইল। কিন্তু পল্লীবাসীর "কপালে নাই ঘি ঠক্ঠকালে হবে কি?" খাল নালা তাহাদের ভরাট হইয়াই চলিল। পূত করে তাহাদের উদর পূর্তি হইল না শুধু জল দিয়াও। উদর পূর্তি হইল বিলাতী কোম্পানীর। উড়িষ্যায় নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এক বিলাতী কোম্পানী খাল কাটাইতে যাইয়া যথেষ্ট টাকা লোকসান দিলেন। কর্তাদের প্রাণ পুড়িয়া উঠিল। পূর্ত্তকরের টাকা দিয়া সাহেব কোম্পানীকে কিছু লাভ দিয়াই গভর্ণমেণ্ট ঐ খাল ক্রয় করিলেন। ফলে দরিদ্র পল্লীবাসীর শোষিত রুধিরে অন্নের রাক্ষসী পিপাসা নিবৃত্তি হইল। কিন্তু পল্লীর অধিবাসী ভবলীলা সাঙ্গ করিতে বসিয়াছে। ভারতবাসীর ভাগে ভারতরূপা কামধেনুর 'উত্তমাঙ্গ' আর কর্তাদের ভাগে 'অধমাঙ্গ'। উত্তমাঙ্গ মুখ দুধ না দিলে ইংরাজের কি দোষ? কি সুন্দর উদার রাজনীতি,

British Justice, ব্রিটিশ ন্যায় বিচার! মুশ্লিমলীগও কি ইহার চেলা সাজিতেছেন?

কৃষির উন্নতি করিতে হইলে জল সেচনাদি পূর্ত কার্যের উন্নতির দরকার। ইংরাজ সরকার বাহাদুর এ বিষয়ে আদৌ মনোযোগী হন নাই। অন্যান্য প্রদেশে পূতকার্যের 'ছিটেফোটা' কৃপা করিয়া দান করিলেও হতভাগ্য বাঙ্গলার কপালে কেবল 'শূন্যবাদ'। পল্লীর কৃষির উন্নতি বিধান করিতে হইলে যে খালনালার প্রয়োজন খুব বেশী, সেই খাল নালার উন্নতির দিকে কর্তাদের দৃষ্টি নাই। লাভজনক সরকারী খাল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কত মাইল আছে তাহা নিম্ন তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে।

প্রদেশ		প্রধান খাল ও শাখা—		বিতরণের নালি
বোম্বাই	—	৫৬০৮	—	৭৯৪
মাদ্রাজ	—	৪০৪৯	—	৮৩০৩
পাঞ্জাব	—	৩৪৩৮	—	১৩:১৯
আগ্রা অযোধ্যা	—	১৪৫৯	—	৮৮০৫
বর্মা	—	৩২২	—	৮৩২
মধ্যপ্রদেশ	—	২১১	—	৮৪৬
সীমান্তপ্রদেশ	—	৮৮	—	২০০
বিহার ও উড়িষ্যা	—	শূন্য	—	শূন্য
বাঙ্গলা	—	শূন্য	—	শূন্য

যাহাতে লাভ হয়না এরূপ খাল নালি কত মাইল আছে তাহাও দেওয়া গেল।

প্রদেশ		প্রধান খাল ও শাখা		বিতরণের নালি
বোম্বাই	—	১৮৯৮	—	১:০৬
বিহার ও উড়িষ্যা	—	৭৬৪	—	২৭৫২
মাদ্রাজ	—	৭৫১	—	৭০৫

আগ্রা অযোধ্যা	—	৪২৮	—	১৩৬২
পাঞ্জাব	—	১৬০	—	১৫২
সীমান্ত প্রদেশ	—	১৪৪	—	৩৪৬
মধ্যপ্রদেশ	—	৬৯	—	১৪০২
বাঙ্গলা	—	৬০	—	২৫৪
বেলুচিস্তান—		৮	—	৭১
বর্ম্মা	—	শূন্য	—	শূন্য

বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি স্বাধীন দেশ পূর্ত্তকার্যাদির উন্নতির ফলে ক্রমশই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা দেখিয়াছে যে নদ নদী খাল নালাগুলি যদি উন্নত এবং প্রচুর জলশালী (Navigable) করা যায় তবে কেবল যে দেশের শস্য সম্ভারেরই উন্নতি হয় তাহা নহে, মাল পত্রাদি আমদানী রপ্তানীও অল্প খরচে সংসাধিত হয়। 'Railway borne traffic' (রেল বাহিত চালান) অপেক্ষা 'River borne traffic' (নদী বাহিত চালান) যে খুব সস্তা তাহা তাঁহারা প্রমাণিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষেও এবং বাংলাতেও যে তাহা আরও সস্তা হইবে তাহাতে কোনও রূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষেও যে পূর্ত্ত কার্য লাভজনক তাহা সরকারী বেতারও বলে। ১৯২৫-১৯২৬ খৃষ্টাব্দের 'ময়্যাল এণ্ড মেটিরিয়েল ব্লু বুক' (Moral and Material Blue Book for 1925—1926, page 269) বলে—" "During the year 1924-25 the total area under irrigation, excluding Indian states amounted to 27. 2 million acres. This represented 12. 4 percent of the entire cropped area of the country.and was about a million acres less than the record area of 28½ million acres irrigated in 1922-23. The total length of main and branch canals and distributaries in operation amounted to about 67,000 miles while the

estimated value of the crops supplied with water from Government works was Rs 152 crores……The total capital outlay on irrigation and navigation works including works under construction, amounted at the end of the year 1924-25 to Rs 93.58 crores. The gross revenue was Rs 10.85. crores. The net return on capital is, therefore, 7.29 per cent" ভারতীয় নৃপতিদিগের রাজ্যগুলি বাদ দিয়া ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দ ধরিয়া সমগ্র জলসেচন স্থান প্রায় ৮১৬ লক্ষ বিঘা। ইহা দেশের সমগ্র শস্যশালী জমির শতকরা ১২·৪ অংশ এবং ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত ৮৫৫ লক্ষ বিঘার প্রায় ৩০।৩৬ লক্ষ বিঘার উপর কম। সেচন কার্যে নিযুক্ত প্রধান এবং শাখা খাল ও প্রণালীগুলির সমগ্র দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৭,০০০ মাইল এবং গভর্ণমেণ্টের জলসেচন হইতে প্রাপ্ত ফসলের আনুমানিক মূল্য ১৫২ কোটী টাকা। ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত নির্মিত হইতেছে এইরূপ প্রণালী সকল লইয়া জলসেচন এবং নৌকাদি গমনের খালে মোট মূলধন খরচ ৯৩·৫৮ কোটী টাকা হয়। মোটামুটি রাজস্ব ১০·৮৫ কোটী টাকা হয়। সুতরাং মূলধনের উপর খরচ খরচা বাদে শতকরা ৭·২৯ লাভ হয়। বর্তমানে ভারতবর্ষে জলসেচন স্থান প্রায় পনর কোটি বিঘা—ইহার মধ্যে খালের দ্বারা ৮ কোটি বিঘা, পুষ্করিণীর দ্বারা ২ কোটি বিঘা, কূপদ্বারা ৩ কোটি ৩০ লক্ষ বিঘা ও অন্যান্য উপায়ে ১ কোটি ৭০ লক্ষ বিঘা জলসেচন পায়। এই ক্ষেত্রের $\frac{৩}{৫}$ অংশ স্থান খাল ও পুষ্করিণীর দ্বারা সেচিত হয় সরকারী আওতায় (অবশ্য ব্রিটিশ সরকার দ্বারাই নির্মিত নহে)। আর সব সেচিত হয় ব্যক্তিগত মালিকগণের দ্বারা।

হিন্দুস্থান ভারত রাষ্ট্রে দামোদর বাঁধ, মহানদীর হীরাকুণ্ড বাঁধ, গঙ্গার বাঁধ, দ্বারা জল সেচন, জল বিদ্যুৎ শক্তি প্রস্তুত, নৌগমন প্রভৃতি দ্বারা অধিকতর শস্য বৃদ্ধির, ব্যবসা বৃদ্ধির ও

নানাবিধ প্রজা মঙ্গলের কাজে ভারত সরকার হাত দিয়াছেন ও দিতেছেন। কিন্তু পাকিস্থান পূর্ব্ববঙ্গে সেরূপ কোনো পরিকল্পনায় আজিও পাকিস্থান সরকার হাত দেন নাই। হিন্দুস্থানে ঐ সমস্ত বাঁধ প্রণালীর দ্বারা বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিম বঙ্গের শস্য সম্পদ অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং তাহার আনুসঙ্গিক পল্লীবোধনে পল্লীপ্রাণ কৃষকের শ্রীবৃদ্ধিও সমুন্নত হইবে নিশ্চয়ই। যথাসম্ভব শীঘ্র খাদ্য শস্যের উৎপাদন বার্ষিক এক কোটি টন অর্থাৎ শতকরা প্রায় ২০ ভাগ বাড়াইবার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত খাদ্য নীতি নির্ধারণ কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছেন ৯।২।১৩৫৫ তারিখে তাহাতে তাঁহারা মনে করেন যে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ দ্বারা ৪০ লক্ষ টন, উন্নত বীজ বপনের ও আবাদী জমিতে জল সেচের ও উৎকৃষ্ট সারের দ্বারা ৩০ লক্ষ টন এবং পতিত জমি আবাদের দ্বারা ৩০ লক্ষ টন ফসল বাড়ানো যাইতে পারে। দেখা যাউক ৫ বৎসরে কি হয়।

খালনালাদি ছাড়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জল সরবরাহের জন্য কূপাদির প্রচলনও খুব বেশী। তাহার সংখ্যাও বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া কৃষির উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে করা যাইতে পারে। ঐ 'ব্লু-বুক'ই বলিতেছে :—"It should not be forgotten however that irrigation in India does not end with her canals. Wells are and always will be a vital factor in Indian irrigation·········In 1924-25 the number of wells bored by Goverment was 1879·········The number bored in the preceding year was 1766.":—অথচ ইহা ভুলিলে চলিবে না যে ভারতে তাহার খালের দ্বারা জল সেচনেই সব কার্য শেষ হয় না। ভারতীয় জল সেচনে কূপগুলি একটা প্রধান অংশ এবং সর্বদাই প্রধান অংশ থাকিবে। ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট ১৮৭৯ সংখ্যক কূপ খনন

করেন। এই কূপ গুলি সমস্তই গরু, মহিষ বা মনুষ্য চালিত। এত বড় একটা দেশের জন্য গভর্ণমেণ্ট করুণা করিয়া মাত্র ১৮০০ বা ১৯০০ কূপ দান করিয়াছেন। প্রত্যেক থানার বা মহকুমার কথা দূরে থাকুক প্রত্যেক জেলাতেই দুই হাজার কূপ দান গভর্ণমেণ্টের পক্ষে আদৌ যথেষ্ট নহে। গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশ হইলে এইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারিত। কিন্তু স্বাধীন ভারত যে গণতান্ত্রিক হয় নাই এখনও! ভারতীয় জনগণ যে পরম সহিষ্ণু! সে যে পরম গর্দ্দভ! সে কেবল ভার বহিবে এবং দিনান্তে যৎকিঞ্চিৎ দানাপানি পাইবে। গাধাও পেট ভরিয়া দানাপানি না পাইলে মোট বস্তা বহিতে চাহে না। কিন্তু পল্লীবাসী, ভারতবাসী এমন সুশীল সুবোধ গাধা যে জেলের কয়দীদের অপেক্ষা খারাপ দানাপানি যৎকিঞ্চিৎ পাইলেই সে বোঝা বহে। সে বোঝা, এমনই পোড়া কপাল, যে স্বাধীন ভারতে বা পাকিস্তানেও কিছু কমিলত নাই-ই বরং বাড়িতেছে খুব বেশী। স্বাধীন হিন্দুস্থানে তবুও কয়েক বৎসরে আশার অনেক লক্ষণ দেখিতেছি। আর পাকিস্থানে কি এ সকলই ফাঁকি!

অন্যান্য ভারতীয় প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলার জল সেচনাদি পূর্ত কার্যের অভাব খুবই বেশী। নদী মাতৃকা বাংলা দেশের এই দুর্দ্দশার কথা কে শ্রবণ করিবে? এই সব খাল নালাদি যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভারত-রাণী পল্লী মায়ের বুকের উপর দিয়া প্রবাহিত হইত, তবে তাহাতে যে স্তন্য প্রস্তুত হইত, তাহা পান করিয়া পল্লীর মাঠ বাট, কান্তার প্রান্তর আবার "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" হইয়া উঠিত। কিন্তু কর্তার যে তাহা ইচ্ছা নহে। বিলাতী কর্তাদের স্থান ও শাসন ক্ষমতা এখন দেশী কর্ত্তারা দখল করিয়াছেন। মুখে তাঁহারা, প্রচারে বিজ্ঞাপনে তাঁহারা তো প্রজাদরদী, কৃষকবন্ধু সাজিয়াছেন। কিন্তু এই কৃষকপ্রজামঙ্গলের পল্লীবোধনের আয়োজন তাঁহারা কতদূর কি করিতেছেন? একমাত্র উন্নততর

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত জলসেচ প্রণালী দ্বারাই তাঁহারা কৃষক ও প্রজাসাধারণের যে মহামঙ্গল করিতে পারেন তাহা তাঁহারা বুঝিয়াও কার্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন না কেন? নদীবহুলা নদীমাতৃকা এই পশ্চিম বাংলার বা পূর্ব বাংলার নদ নদী খাল বিল গুলির জল ধারণ ও জল বহন প্রণালীর উন্নতি বিধান করিতে পারিলেই পল্লীবোধন ও পল্লী মঙ্গল এবং পল্লীর মঙ্গলে হিন্দুস্থান পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রেরই যথার্থ মঙ্গল সাধিত হইবে। বিহার পশ্চিম বঙ্গের দামোদর নদীতে বাঁধাদি দ্বারা, উড়িষ্যার মহানদীর হীরাকুণ্ড বাঁধ আদি দ্বারা জলবিদ্যুৎ শক্তির (hydro-electric power র) দ্বারা ভারত রাষ্ট্রে ও পশ্চিম বঙ্গ প্রভৃতিতেও যে উন্নততর ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ, জলসেচ প্রণালী, নদীপথে ব্যবসা বাণিজ্যের অল্প খরচে অনেক সুবিধা, শস্য সম্পদের উন্নতি বিধান, কৃষিবল বলদ গাভী আদির প্রচুর খাদ্য পাওয়ার সম্ভাবনা এবং স্বাস্থ্যোন্নতির যে বিশাল ও ব্যাপক সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা কাজে পরিণত করিবার জন্য ভারত রাষ্ট্র ও বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিম বঙ্গাদি ভারত রাষ্ট্রান্তর্গত প্রদেশাদি যে পরিকল্পনা কাজে পরিণত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা পূর্ণ ফল প্রসূ হইতে ৮।১০ বৎসর সময় লাগিবে বটে, তথাপি সেই স্থানের অধিবাসীদের পল্লীবাসীদের বিশেষত, সম্মুখে একটা মস্ত বড় আশা ভরসার প্রভাতী আরতির মঙ্গল সম্ভাবনা দেখিতেছি, কিন্তু পাকিস্তান পূর্ববঙ্গের সম্মুখে সে মঙ্গল আরতির সম্ভাবনা কই? মুস্লিমলীগ কর্তাদের সে দিকে লক্ষ্য নাই। তাঁহারা কেবল প্রজাশোষণ, পল্লীর রক্ত মোক্ষণ করিয়া বিশেষ ভাবে পূর্ব বাংলার নানা ভাবে ক্ষতি করিয়া পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের করিতেছেন সুরাহার চেষ্টা। পাকিস্তান গণপরিষদে মোট ৬৯ জন সদস্যের মধ্যে ৪৩ জন বাঙ্গালী সদস্য হইয়াও ২৬ জন অবাঙ্গালীর অর্থনৈতিক স্বার্থ

সিদ্ধি ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রভুত্ব হইতে পূর্ব বাঙ্গলার স্বার্থ, অধিকার ও অর্থনৈতিক সমস্যাদির সমাধান করিতে পারিতেছেন না। পূর্ব বাংলায় এই সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অবাঙ্গালীর স্বার্থে কমাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং আরও হইবে। তাঁহারা, সংখ্যাগরিষ্ঠ এই বাঙ্গালী সদস্যরা, যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পল্লীমঙ্গলে জলসেচ প্রণালীর উন্নতি বিধানের জন্য চেষ্টা করেন, তবে অনেক কিছু মহৎ কর্ম, এই পাকিস্তানের ধানের গোলা ও ধন ভাণ্ডার পূর্ববঙ্গেই হইতে পারে। পূর্ববঙ্গও যদি জলবিদ্যুৎশক্তির বোধন ও কর্মক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন, তবে পূর্ব বঙ্গও আবার দ্রুত সমৃদ্ধিশালী হইয়া সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা হইতে পারিবে। ওই সব পরিকল্পনার প্রয়োগের অপেক্ষায় না থাকিয়া উহারই সঙ্গে সঙ্গে শীঘ্র শীঘ্র ফলদান করিবার জন্য পল্লীর মাঠে মাঠে প্রশস্তর ও অধিকতর জল উত্থান শক্তি সম্পন্ন, ছয়সাত ইঞ্চি হইতে একহাত ব্যাসের নলকূপ সমূহ, কৃষি সম্বন্ধীয় 'পাম্প' (Agricultural pump) সমূহ সমবায় প্রণালীতে নির্মাণ করিয়া প্রতি মাঠে মাঠে ব্যাপক জল সেচের যদি ব্যবস্থা করা যায়, তবে বাংলার কৃষক অন্তত বৎসরে তিনটি ফসল চমৎকারভাবে পাইতে পারে। সময়ে উপযুক্ত জলসেচ পাইলে বাংলায় বৈশাখ মাসেই সর্বত্র আউসধান বোনা যাইতে পারে এবং আকাশের জলের দিকে না তাকাইয়া পৃথিবীর বুক হইতে ভোগবতী গঙ্গাকে নলকূপের সাহায্যে তুলিয়া আউস ধানের ক্ষেতে দিতে পারিলে শ্রাবণের প্রথমেই বাংলার কৃষক ও কৃষিজীবী প্রচুর আউস ধান পাইতে পারেন এবং পাটের আবাদও সুন্দর হইতে পারে। আর সময়ে গোড়ায় প্রচুর জল পাইয়া তাহারা বর্ধিত হওয়ায় বর্ষার প্রথম আগমনে তাহাদের ডুবিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে আমন ধানাদি রোপনের সুবিধা ও বুননের সুবিধা পাইয়া এবং রোপিত ও বুনিত ক্ষেতে প্রয়োজন মত নলকূপের প্রচুর জল

দিয়া আমন ধানের সম্পদও প্রচুর পাওয়া যাইতে পারে। তাহার পরে পৌষ মাসে আমন ধান কাটিয়া, জমি চাষ করিয়া পরে প্রচুর জল সেচন করিয়া নলকূপের সাহায্যে পৌষ মাসেই প্রচুর বোরা বা জাগুলি ধান লাগান যাইতে পারে। উপযুক্ত জল পাইলে এই বোরা বা জাগুলি ধান কেবল বিলাদি জলবহুল স্থানেই উৎপন্ন হইবে না। আল বাঁধিয়া উচ্চ জমিতেও তাহা প্রস্তুত করা যাইবে। এইভাবে বাংলার কৃষক বৎসরে তিনটী ধান বা তিনটী ফসল ব্যাপকভাবে পাওয়ায় এবং অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির কুফল হইতে অনেকখানি রক্ষা পাওয়ায় তিন গুণ বা অন্তত পক্ষে দ্বিগুণ ধনশালী হইবে। আর সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রেরও নানাভাবে আয় বৃদ্ধি হইবে। নলকূপ ও কৃষি পাম্পাদির সাহায্যে প্রচুর ঘাস, বিচালির ও আউড়াদি পাইয়া কৃষি বল গোসম্পদেরও জুটিবে প্রচুর আহার এবং তাহার ফলে তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষমতাই কেবল বাড়িবে না, গাভীগুলিও প্রচুর দুগ্ধ দিবে। এই সমস্ত উন্নত প্রণালীর নলকূপ ও কৃষি কূপের সাহায্যে পল্লীবাসীও ভাল জল পাইয়া স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে পারিবে এবং কলেরা, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়াদিতে অনেক কম মরিবে। ইহাতে মৎস্যাশী বাঙ্গালীর মৎস্য বংশেরও হইবে বংশ বিস্তার এবং তাহার দ্বারা বাঙ্গালীর রসনার তৃপ্তি ও উদর ভরণাদি সবই চলিবে। উপযুক্ত জল সরবরাহের ও জল সেচনের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা যদি দেশ বা রাষ্ট্র স্বাধীন হইয়াও গ্রহণ করিতে না পারে, তবে তাহার স্বাধীনতায় কী লাভ আছে? পল্লীবাসী স্বাধীনতার আস্বাদ তখন বুঝিবে যখন সে পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিগণ যদি পল্লীবোধনের, প্রজামঙ্গলের এই আশু এবং অত্যধিক সুফলপ্রদ কর্ম প্রণালী অবলম্বন না করেন, তবে সাবধান পল্লীবাসী, তোমাদের সেই সব অকর্মণ্য, তোমাদেরই স্বার্থের অবহেলা পরায়ণ, সেই সমস্ত ভূয়া প্রতিনিধিগণকে অবিলম্বে

সরাইয়া তোমাদেরই উপযুক্ত প্রতিনিধিকে সে স্থানে বসাও এবং তাহাদের নিকট হইতে পল্লীবোধনের, পল্লীমঙ্গলের কাজ আদায় কর। প্রজা সাধারণ যে দেশে ঘুমন্ত, অচেতন, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থ নৈতিক চোরা কারবার ও কালাবাজার দমনে পরান্মুখ তাহাদের দুঃখ, দৈন্য দুর্দশা অনিবার্য শুধু নহে, তাহারা নেপথ্যে পরাধীনতার পথ প্রস্তুত করিতে থাকে। নিশ্চেষ্ট জড়ের জন্য, চরিত্রহীন রাষ্ট্রীয় চোর ডাকাতের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নহে। পল্লীবোধনে অন্নসমস্যা সমাধানে বর্তমানে ইহাই একমাত্র প্রধান পথ। সাবধান বচনবাগীশ, কলহ পরায়ণ, দলাদলি মত্ত, ক্ষুদ্র স্বার্থ লোভী, অর্থ গৃধ্নু পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গের হিন্দু মুসলমান, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যদি তোমরা আনিতে পারিয়াছ তবে তাহা কূলে আনিয়া ভরাডুবি করিওনা। দুর্নীতিতে ভরা বর্তমান রাষ্ট্রীয় সংস্থানগুলি দুর্নীতি ত্যাগ করিয়া নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই সমস্ত জলসেচপ্রণালী সমবায়সমিতিতে গঠন করিয়া সরকারী সাহায্যে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই আমরা অন্নসমস্যা দূর করিতে পারিব। পূর্ব বঙ্গের ও পশ্চিম বঙ্গের কৃষক কুলের নিকট হিন্দুস্থান পাকিস্তান সমস্যা প্রবল নহে, তাহাদের অন্নসমস্যাই প্রবল। আজ সেই আসল অন্নসমস্যাকে ধামা চাপা দিয়া পাকিস্তান হিন্দুস্থানের জিগির তুলিয়া হিন্দু মুসলমানে দলাদলি ঝগড়া মারামারি বাধাইয়া তোমাদিগকে, বাংলার পল্লীপ্রাণ কৃষক কুল তোমাদিগকে লইয়া যাহারা জুয়া খেলিতেছে, তাহাদের সর্বনাশা নীতি হইতে কবে তোমরা আত্মরক্ষা করিতে পূর্ববঙ্গ পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু মুসলমান কৃষক শ্রমিক সবাই সঙ্ঘবদ্ধ হইবে? তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ ও সংগঠিত না হইলে অন্নসমস্যায় আশু ফলপ্রদ এবং অত্যধিক শুভ ফলপ্রদ এই জলসেচপ্রণালী কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে না। বঙ্গবাসী, ভারতবাসী, হিন্দু মুসলমান মনে রাখিও "নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ"—সুপ্ত সিংহের মুখে কখনও মৃগ খাবার হাজির

হয় না। ঘুমন্ত বাঙ্গালী, ঘুমন্ত ভারতবাসী, পল্লীবাসী তোমাদের মুখে এমনিই খাবার আসিয়া হাজির হইবে না। তোমাকেও গণসংগ্রামে তাহা আহরণ করিতে হইবে। তাহার জন্য পল্লীতে সংগঠিত ও সংঙ্ঘবদ্ধ হও এবং তোমাদের সম্মিলিত দাবী দাওয়া হিন্দুস্থান বা পাকিস্তান উভয় সরকারের নিকট শক্তিতে পেশ কর। তোমরা রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা নামে মাত্র পাইয়াছ। অর্থ-নৈতিক ও শীলনৈতিক বা চরিত্রনৈতিক স্বাধীনতা আজও তোমরা পাও নাই। তোমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার স্রোত এখন এই দুই প্রদেশে তর তর বেগে প্রবাহিত করিবার আশু প্রয়োজন আসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য প্রস্তুত হও। পল্লীবোধনে নব জাগ্রত রাষ্ট্রীয় চেতনার সংগঠন শক্তি আনিয়া ফেল দুর্জ্জয় বেগে ঐরাবত বাধা সব ভাসাইয়া অর্থনৈতিক ও চরিত্রনৈতিক অক্ষমতা সমূহের সমাধানে।

পল্লীর বুকের উপর দিয়া সে ক্ষীরধারা, সে অমৃতের নিস্যন্দ বহিল না; তাহার বুক ডলিয়া, মর্ম পীড়ন করিয়া চলিল লৌহবর্ত্ম, রেলগাড়ী। আর এই রেলের রাস্তার জন্য কত শত নদ নদী যে ভরাট, সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল, কত লক্ষ লক্ষ জলাশয় যে জল শূন্য হইয়া উঠিল, প্রকৃতির দান কত লক্ষ লক্ষ পয়ঃপ্রণালী যে রুদ্ধ মৃতপ্রায় হইয়া উঠিল, তাহার সাক্ষ্য স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ডাক্তার সি. এ. বেন্টলী সাহেব পর্য্যন্ত দিলেন। তাঁহার পূর্বে ম্যালিরিয়া কমিশনে সাক্ষ্য দিবার সময় রেল লাইন বিস্তারের ফলে সর্বত্র ম্যালিরিয়ার বৃদ্ধি, একথা রাজা দিগম্বর মিত্র বলিয়াছিলেন। সার প্যাট্রিক ম্যাসন তাঁহার প্রণীত 'Tropical Diseases' নামক গ্রন্থেও এই কথা বলিয়াছেন। বড় বড় বন্যায় বা জল প্লাবনে যখন দেশকে দেশ ধ্বংস হইয়া যায় তখন দেশী বিদেশী সকল সংবাদ পত্রেই এই স্বর বাজিয়া উঠে, এই আর্তনাদ ধ্বনিত হয়। মৃতপ্রায়

জাতির ক্ষীণকণ্ঠ কেবল আর্তনাদ করিয়াই ক্ষান্ত হয়। কিছুকাল পূর্বে দমদমা অঞ্চলে যখন রেলের রাস্তার জন্য অনেক ঘর বাড়ী, পল্লী গ্রাম নষ্ট হইত তখন শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল এ বিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ করেন। 'অমৃত বাজার পত্রিকার' ৺শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় সে আন্দোলনে যোগ দিয়া তাহাতে প্রবল শক্তি সঞ্চার করেন। তাহার ফলে লর্ড ষ্ট্যান্‌লী অভ্ মর্ডারলী পার্লামেণ্টে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। পরে উত্তর বঙ্গে বন্যা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বাঙ্গলা সরকার যে কমিটী নিযুক্ত করেন তাহার অন্যতম সদস্য আবহবিদ্ কর্মচারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ যে রিপোর্ট দেন সরকার তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রিপোর্টে আছে যে উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ স্থানে জল নিকাশের ব্যবস্থা সন্তোষজনক নহে। মধ্যস্থলে পলি পড়িয়া জমি উচ্চ হইয়া উঠিতেছে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নদী-গর্ভেরও অবনতি হইতেছে। রেলের বাঁধ ও অন্যান্য বাধায় জলের স্বাভাবিক প্রবাহ পথ বন্ধ হওয়ায় যে এই ব্যাপার দ্রুত সংঘটিত হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। সময় সময় রেলের বাঁধে জল আটকাইয়া থাকায় বন্যা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছে। যশোহরের উকীল ৺রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এ বিষয়ে অনেক আলোচনা ও গবেষণা করিয়া যে সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাও এই সমস্ত মত সমর্থন করে। কিন্তু কে তাঁহাদের কথায় কান দেয়? কর্তাদের শোষণ ক্রিয়ার এক প্রধান অস্ত্র এই রেল লাইন, তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে আর খাল নালাগুলি মরিয়াই চলিয়াছে। মহামূর্খ পল্লীবাসী আবার তাহাদের মৃতদেহ দিয়া এই সব মৃত খাল নালা গুলিকে যমরাজার পত্নীদিগের 'আঁতুড় ঘর', করিতেছে। "মরন রে তুঁহু মেরা শ্যাম সমান"—হতভাগ্য পল্লীর আর্ত্তকণ্ঠেই সাজে।

পল্লীমায়ের গালাগালি 'মর মর', 'গোল্লাই যা'! হায় পল্লীবাসী! ভবজ্বালা জুড়াইবার একমাত্র পন্থা তোমার মরণ; তাই তুমি মরিতেছ। গভর্ণমেণ্ট এত রেল লাইন না বাড়াইয়া, অথবা বাড়াইলেও, তাহাপেক্ষা পূর্তকার্য বা জল প্রণালী প্রভৃতির যদি অধিকতর উন্নতি সাধন করিতেন, তবে কেবল যে পল্লীর কৃষি-কার্যের উন্নতি হইত তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যেরও উন্নতি হইত। বৎসর বৎসর কোটী কোটী টাকা রেলের জন্য ব্যয় হইতেছে, আর পূর্তকার্যে হাজারে হাজারেও ব্যয় হয় না। গবর্ণমেণ্ট যে কেবল ইংরাজের স্বার্থরক্ষণের জন্য, শোষণ নীতির জন্যই এইরূপ পূর্তকার্যে অবহেলা করিয়া আসিতেছেন তাহা ১৯০৩ খৃষ্টাব্দেও অক্টোবর মাসের Asiatic Quarterly Review পত্রে জেনারেল জে. এইচ. ফিশার. আর. ই, নামক এক ইংরাজ ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। "No words could have better described the railway administration in India during the past half century; the advocates of this system have never ceased to din into the ears of the public in England "the incalculable benefits" the railways have conferred on India without producing the shadow of any evidence to support their assertions. Those works of extreme utility (পূর্ত কার্যাদি) without which it is impossible to make land of any country valuable, have been entirely neglected, being too mean and paltry for the consideration of such very great minds; and the results have been that the country has been brought to the verge of ruin and its whole population are in the most pitiable condition of hopeless poverty, misery and

desolation"। গত অৰ্দ্ধ শতাব্দীতে ভারতে রেলওয়ে কার্য নিষ্পাদন সম্বন্ধে ইহাপেক্ষা আর ভাল বর্ণনা করা যাইতে পারে না। এই ব্যবস্থার উকিলেরা তাঁহাদিগের দাওয়া সম্বন্ধে প্রমাণের ছায়া মাত্রও না দিয়া ইংলণ্ডের জনসাধারণের কর্ণে অনবরত ধ্বনিত করিতেছেন যে রেলসমূহ ভারতের অসংখ্য উপকার সাধন করিয়াছে। এই সমস্ত পরম উপকারের কার্যগুলি (পূর্ত কার্যাদি) যাহা ব্যতিরেকে কোনও দেশের জমি মূল্যবান্ হইতে পারে না, সেই পূর্তকার্যগুলি এই সমস্ত বড় বড় মনের পক্ষে অতীব হীন এবং ঘৃণ্য বিবেচিত হওয়ায় সম্পূর্ণ অবহেলিত হইয়াছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে দেশ ধ্বংসের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহার সমগ্র অধিবাসী নৈরাশ্যপূর্ণ দারিদ্র্য, দুর্গতি এবং বসতি-শূন্যতার চরম দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখের 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' সংবাদ পত্রও এই রেল লাইনের ফলে বঙ্গদেশের ব্যবসা বাণিজ্যও যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহা ব্যক্ত করেন। "The question of railway versus river borne traffic is of great importance in Lower Bengal where the absence of feeder roads is compensated for by the presence of innurmerable small rivers teeming with country boats. These feeder-rivers are being greatly damaged by the efforts of Engineers to construct cheap bridges, and the cutting of the headways to effectuate economy, has seriously interfered with river traffic. It is a mistaken policy in view of the gigantic amount of river borne trade, and is merely killing the goose that lays the golden eggs." :—রেল পথের বিরুদ্ধে নদী পথে বাণিজ্য প্রশ্ন নিম্ন বঙ্গের পক্ষে অতীব মূল্যবান্। দেশী নৌকায় পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য নদীর দ্বারা নিম্ন বঙ্গে এই সমস্ত সরবরাহ-

কারী রাস্তার অভাব পূরণ করা হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারদিগের সস্তায় সেতু নির্মাণ চেষ্টায় এই সমস্ত সরবরাহকারী রাস্তার অনেক পরিমাণে ক্ষতি হইতেছে এবং পরিমিত ব্যয় সাধনের নিমিত্ত প্রধান পথগুলি কাটায়, তাহা নদী বাণিজ্যের গুরুতর রূপে প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে। নদী বাহিত প্রকাণ্ড বাণিজ্য পরিমাণের দিক দিয়া ইহা একটী ভ্রান্ত নীতি এবং যে হাঁসটী সোনার ডিম দিতেছে তাহাকে কেবল মারিয়া ফেলা হইতেছে। ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দের বাজেট বিচার কালে যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার কথা অরণ্যে রোদন এ পরিণত হয়। এই রূপে এ সম্বন্ধে অনেকের আবেদন, নিবেদন, ক্রন্দন, অরণ্যে রোদনেই পরিণত হইয়া আসিতেছে—রেলের জাল খাল বিল নদ নদী গুলিকে মজাইয়া, মরাইয়া, দেশের বুকে আসন জুড়িয়া বসিতেছে। ইংরাজ রাজের এই রেল লাইন বিস্তারে যে কি গূঢ় উদ্দেশ্য আছে তাহা ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের 'নিউ ইংল্যাণ্ড ম্যাগাজিন' পত্রে রেভারেণ্ড জে. টী. সাণ্ডারল্যাণ্ড মহাশয় প্রকাশ করিয়া বলেন। "Whatever lack of money there may be for education or for sanitary improvements or for irrigation or for other things which the people of India so earnestly desire and pray for, the Goverment always seems to have plenty for railways. Why ? Becuse the railways of India help the English people to wealth......... The railways have broken up many of the old industries of India, and thus have brought hardships and suffering to millions of people, but they enrich the ruling nation and they give her a firmer military grip upon her valuable dependency and so money can always be found for them,

whatever else suffers." ভারতের লোকেরা ঐকান্তিক ভাবে যাহা চাহে এবং প্রার্থনা করে সেই শিক্ষা অথবা পূর্তকার্য বা অন্য কোন কার্য্যের জন্য যতই অর্থাভাব থাকুক না কেন, রেলের জন্য গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বদাই প্রচুর অর্থ আছে। কেন? কারণ ভারতের রেলপথ সমূহ ইংরাজদিগকে ধনী হইতে সাহায্য করে।......রেলপথ সমূহ ভারতের বহু পুরাতন শিল্পের ধ্বংস সাধন করিয়াছে। এবং লক্ষ লক্ষ লোককে দুঃখকষ্টে ফেলিয়াছে; কিন্তু তাহারা শাসক জাতিকে ধনী করে এবং তাহারা তাহার মূল্যবান অধীন রাজ্যের উপর দৃঢ়তর সামরিক ক্ষমতা দেয়। সুতরাং অন্য যে কিছুরই ক্ষতি হউক না কেন, তাহাদিগের (রেলপথ সমূহের) জন্য সর্বদাই অর্থ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ১৩৩৪ সালের ১লা পৌষের 'বসুমতী' লিখিয়াছিলেন-"এ দেশে যখন প্রথম রেলপথ বিস্তারিত হইয়াছিল তখন কি দেশের সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল? বিদেশী বনিকদিগের ব্যবসার প্রসারের দিকে তখন কর্তৃপক্ষের এত আগ্রহ ছিল যে, রেলওয়ে বাঁধে দেশের জল নিকাশে বিঘ্ন ঘটিবে এবং তাহার পরিণাম বিষময় হইবে, তাহা ভাবিবারও তাঁহারা অবসর পান নাই। তাহার পর যখন রেলওয়ে নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে মহামারী উপস্থিত হইল এবং তাহার প্রতিকারের নির্ধারণ জন্য কমিশন বসিল তখন রাজা দিগম্বর মিত্রের ন্যায় বহুদর্শী বাঙ্গালী রেলওয়ের ও অন্যান্য বড় বড় রাস্তার উচ্চ বাঁধে দেশের স্বাভাবিক জল নিকাশে বাধা পড়িতেছে, ইহা প্রদর্শন করিলেও তাঁহারা সে কথা গ্রাহ্য করেন নাই।" ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারীর দৈনিক 'অমৃত বাজার পত্রিকা' তাঁহার সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছিলেন—"The Railways are one of the most effective instruments of exploitation in the interest of the British manu-

pacturer, the British unemployed and British rule," ব্রিটিশ শাসন, ব্রিটিশ বেকারদিগের এবং ব্রিটিশ শিল্পীদিগের স্বার্থের খাতিরেই রেলপথ সমূহ শোষণের এক প্রধানতম ফলোৎপাদক যন্ত্র। লালা লাজপাত রায় তাঁহার 'Unhappy India'র ৩৮২ পৃষ্টায় লিখিয়াছেন :—"But the story how these railways were built, financed and worked is nothing short of a scandal. Indian railway policy has never shown much regard for India's interests. Its chief concern has been Britain's strategical or commercial advantage. The Indian railways were built or worked by British companies who ran no risk whatever, but who fleeced the Indian taxpayer of crores of rupees." কি উপায়ে এই রেলপথ সমূহ নির্মিত, অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত এবং চালিত হইয়াছিল তাহার কাহিনী কলঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নহে। ভারতীয় রেলপথ সমূহ ভারতের স্বার্থের দিকে কখনও দৃষ্টি করে নাই। ব্রিটিশের সমর নীতি ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় সুবিধাই হইয়াছে ইহার প্রধান প্রয়োজন। ভারতীয় রেলপথ সমূহ ব্রিটিশ কোম্পানীর দ্বারা নির্মিত বা চালিত হইয়াছিল ; তাহারা কোনও ঝুঁকি লয় নাই এবং ভারতীয় করদাতাদিগের নিকট হইতে কোটী কোটী টাকা নিষ্কাষিত করিয়াছে। ১৯২৮, ৯ই মার্চ্চ তারিখের পত্রিকাতেও এই আর্ত্তনাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে—"For over sixty years the Patrika has been carrying on a systematic campaign against the wrong headed policy of the Government which is bent upon weaving a net work of Railways at the expense of the waterways of India—especially of Bengal. While Bengal's waterways are being silted up no systematic attempt is made to dredge

them and keep them open, though the Railways are having all the money they require for further increasing the mileage." ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গলার জলপথ সমূহের ক্ষতি করিয়া রেলপথ সমূহের জালবিস্তৃত করিতে সমুদ্যত হইয়া গভর্ণমেণ্ট যে ভ্রান্তবুদ্ধি যুক্তনীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে 'পত্রিকা' প্রায় ৬০ বৎসরের উপর নিয়মিত আন্দোলন চালাইতেছে। বাঙ্গলার জলপথগুলি ভরিয়া আসিতে থাকিলেও তাহাদিগকে কাটাইয়া খোলা রাখিবার কোনও প্রণালীবদ্ধ চেষ্টা হইতেছে না, যদিও রেলপথ সমূহের অধিকতর বিস্তৃতির জন্য তাহাদিগের প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থই পাইতেছে। মিশর গভর্ণমেণ্টের পূর্ত বিভাগের বিশেষজ্ঞ স্যার উইলিয়ম উইলককৃস বাঙ্গলা দেশের পূর্ত কার্যাদি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন :—"The fall of the subsoil water, severest in the north and less severe as one goes south is telling on the fertility of the countless mangoe and other fruit trees, which are shallow rooted as they were once accustomed to other conditions. The absence of pools has deprived most of the peasantry of the fish they once had in abundance. Drinking water is often scarce. The food of the peasantry is as little nourlshing as food can be, and they are, on the top of it, scourged with malaria which nothing but the rich red water of the Ganges flood or leguminous fodders can combat ; and these are the two things they never see.

"And now I come to the remedy for all this deterioration and decay. The decay of both health and wealth is due to the fact that the country has been deprived of its

rich red flood water. In Egypt we consider a red water famine as the greatest calamity which can overtake the country. Such a famine has overtaken both central and western Bengal. The real remedy is the restoration of the perfect system of 'over flow irrigation' so well suited to Bengal." ঃ—মাটির নীচের জল কমিয়া যাওয়ায় তাহা উত্তর ভারতে খুব তীব্রভাবে এবং ক্রমশঃ দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত কম তীব্রভাবে আম্র এবং অন্যান্য ফলবৃক্ষের ফলোৎপাদন শক্তি হ্রাস করিতেছে। এই সমস্ত বৃক্ষের শিকড় মাটীর নীচে অনেক দূর যায় না কারণ তাহারা এক সময়ে অন্যরূপ অবস্থায় অভ্যস্থ ছিল। জলাশয়ের অভাবে অধিকাংশ কৃষকেরা যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মৎস্য পাইত তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে। পানীয় জল অনেক সময় দুষ্প্রাপ্য। কৃষকদিগের খাদ্য যত কম পুষ্টিকর হইতে পারে তাহা হইয়াছে; ইহার উপরে তাহারা আবার ম্যালেরিয়ায় শাস্তি পাইতেছে। এই ম্যালেরিয়া গঙ্গার জোয়ারের সারী লালজল বা কলাইশুটী সম্বন্ধীয় খাদ্য ব্যতিরেকে অন্য কিছুতেই দূর করিতে পারে না; এবং এই দুইটী খাদ্যই তাহারা কখনো দেখে না। এখন এই সমস্ত ক্ষয় এবং পতনের উপায় নির্দ্ধারণে আসিতেছি। স্বাস্থ্য এবং ধনের হ্রাসের কারণ এই যে—দেশ ইহার সারযুক্ত লাল বন্যার জল হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। মিশরে এই লাল জলের অভাব দেশের উপর আসিলে তাহা সর্ব্বাবেক্ষা গুরুতর বিপদ বলিয়া মনে করে। এইরূপ অভাব মধ্য এবং পশ্চিম বঙ্গের উপর পড়িয়াছে। বাঙ্গলার এত সুন্দর উপযুক্ত বন্যা প্লাবিত জলসেচনের এই অত্যুত্তম পদ্ধতির পুনরুদ্ধারই প্রকৃত উপায়। স্যার উইলিয়ম উইলককস 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে' পঠিত তাঁহার 'Restoration of ancient Irrigation in Central and Western Bengal' প্রবন্ধে যে প্রণালী অনুযায়ী কার্য্য করিলে এইসব পূর্ত কার্য্যে বাঙ্গলা আবার সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতে

পারে তাহা পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু দেখাইলে কি হইবে? কর্ম্মের পথ, মঙ্গলের পথ, পল্লী উদ্ধারণের পথ অনেকেই দেখাইয়াছেন এবং দেখাইতেছেন, কিন্তু তাঁহারা যে খোদকর্ত্তা নহেন। "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম"। কর্তার এ কর্ম্মে কাজ নাই। এই কর্তা যতদিন ভারতবাসী জনসাধারণ নিজে না হইতে পারিবে ততদিন মঙ্গলের আর অন্য পথ নাই। তাই চাই স্বরাজ, স্বাধীনতা।

কাগজে কলমে দেখিতেছি স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রে ও স্বাধীন পাকিস্তানে নাকি স্বাধীনতা আসিয়াছে, তাঁহারা নাকি কর্তা হইয়াছেন—এই দুই রাষ্ট্রের।

হিন্দুস্থান ভারত রাষ্ট্রের কর্তা হইয়াছেন কংগ্রেসী দল। তাঁহারা হাতে ক্ষমতা ও প্রভুত্ব পাইয়া প্রথমেই অন্য সব দল উপদলের রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় স্থান ত দিলেনই না পরন্তু রাষ্ট্র নীতির কার্যকরী চর্চা হইতে পর্যন্ত তাঁহাদের বঞ্চিত করিলেন। পশ্চিম বাংলায় এক রাষ্ট্রীয় উপদল আর এক রাষ্ট্রীয় উপদলের সহিত লড়াই করিবে না, পল্লীমঙ্গল, প্রজামঙ্গল করিবে? দোষত্রুটী দুই উপদলেরই আছে। বাঙ্গালীর চারিত্রিক দুর্বলতা যে ওই দলাদলি গৃহবিবাদ তাহা আমরা কতদিনে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ওই চারিত্রিক দোষ সংশোধন করিব? ইহাদের আমলেও প্রজাপুঞ্জের যথার্থ প্রতিনিধিগণ এখনও রাষ্ট্র ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন নাই। ইঁহাদেরও ব্যয় ভার বৃটিশ সরকার আমলের মত প্রায়। ইঁহাদের আমলে করভার বৃটিশ সরকার আমলের করভার হইতেও অত্যধিক বাড়িল। জনসাধারণের দুর্দশা, দুঃখ দৈন্যাদির বহর বাড়িয়াই চলিতেছে স্বাধীনতা পাইয়াও। সর্ববিধ খাদ্যদ্রব্য হইতে কাপড়, লোহা, টীন, সিমেণ্ট, সোডা, সাবান, সুপারি, তামাক প্রভৃতি সব জিনিষেরই অগ্নিমূল্যে জনসাধারণ না পাইতেছে পেট ভরিয়া খাইতে, না পারিতেছে পাছা ঘেরিয়া কাপড় পরিতে, না পারিতেছে মাথা গোজার ঠাঁই করিতে, না পারিতেছে কাচ্চা বাচ্চা গুনোর

নিরক্ষরতা ও মূর্খতা দূর করিতে, না পাইতেছে রোগে, মরণশয্যায় ঔষধ, পথ্য। পাকিস্তান পূর্ব্ববঙ্গে এই দুরাবস্থার বহর বাড়িয়াছে অত্যধিক। তাহার উপর পাকিস্তানের মুসলমান কর্ত্তারা এবং তাঁহাদের চেলা-চামুণ্ডারাদল হিন্দু জনসাধারণের উপর, যেরূপ জুলুমবাজি আরম্ভ করিয়াছেন এবং এখনও সদর্পে চালাইতেছেন, তাহাতে পূর্ব্ব পাকিস্তান পূর্ব বাংঙ্গলার হিন্দুগণ স্বাধীনতা যে লাভ করিয়াছে, তাহারা যে পূর্ব বাঙ্গলার কর্তা হইয়াছে মুসলমান ভাইদিগের সহিত, ইহা তাহারা আদৌ ঠাহর করিতে পারিতেছে না; অধিকন্তু পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণের ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে তাহারা বর্ত্তমানে ব্রিটিশের পরাধীন না হইয়া মুসলমানের বা মুস্‌লিম লীগের পরাধীন হইয়াছে। আর এই মুস্লীম লীগের পরাধীনতায় পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান জনসাধারণও নানা করভারে, চোরাকারবার কালা বাজারাদি নানা দুর্নীতিতে এতই উৎপীড়িত হইতেছে যে, যথার্থ স্বাধীনতার আস্বাদ তাহারা কিছুই পাইতেছে না। এক উপদলীয় রাষ্ট্র স্বার্থের যুপকাষ্ঠে বা জবাই স্থানে তাহারা যে ভবলীলা সাঙ্গের যোগাড় করিতেছে—ইহাই ক্রমশ উপলব্ধি করিতেছে—তাহার স্বর হুকুম নামায় দাবাইবার চেষ্টাতেও পরিস্ফুট। পাকিস্তান গণপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ৬৯ জন; তন্মধ্যে পূর্ব্ব বাংলার সদস্য সংখ্যা (শ্রীহট্ট সহ)—৪৩ জন আর পশ্চিম পাঞ্জাবে, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থান সদস্য সংখ্যা ২৬ জন। ৬৯ জন মধ্যে ৪৩ জন বাঙ্গালীর বঙ্গরাষ্ট্র ভাষা বাংলা হইবে না, হইবে ২৬ জনেরও অনেক কম সদস্যের উর্দ্দু ভাষা। বাঙ্গালী মুসলমানের গণতন্ত্রের নমুনা এই। পাকিস্তানেও সংখ্যালঘিষ্ঠ অবাঙ্গালী প্রভুদের পরাধীন হইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী মুসলমান বেতালে নাচিতেছে আর ভাত, কাপড়, কাঠ, টিন, চিনি, নুন, তেলের অভাবে "ম'লাম ম'লাম" বলিয়া নেপথ্যে কাঁদিতেছে। ইহারই নাম প্রজা-মঙ্গল, স্বাধীনতা। ইহা গণতন্ত্রের রাষ্ট্রনৈতিক রঙ্গ না ব্যঙ্গ! কাজেই

কৃষকরাজ, শ্রমিক রাজাদি দলীয় উপদলীয় রাজ প্রধান প্রশ্ন নহে; প্রধান সমস্যা যথার্থ গণরাজ, জনগণের যথার্থ ধার্মিক, চরিত্রবান ন্যায়পরায়ণ প্রতিনিধিগণ পরিচালিত জনগণের নিকট দায়ীত্বশীল গণতান্ত্রিক স্বরাজ। অন্নবস্ত্রাদির সমাধান তাহাতেই।

রাজস্ব, করাদি রাষ্ট্রের অর্থাগম, আর্থিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে সরবরাহ করিতেছে যে কোটী কোটী জনগণ, তাহারাই তাহাদের প্রতিনিধি দিয়া করে যদি তাহাদের অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, শিক্ষা, জীবিকাদির ব্যবস্থা, তবে তাহাতেই হইবে যথার্থ গণতান্ত্রিক স্বরাজ; আর সেই গণতান্ত্রিক স্বরাজই কেবল করিতে পারে যথেষ্ট প্রজামঙ্গল, প্রজা জনসাধারণের অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, শিক্ষা, জীবিকাদির ব্যবস্থা কর্মক্ষেত্রে করিয়া।

মহামূর্খ পল্লীবাসী চাষার দল রেল গাড়ীতে চড়িয়া আরাম করে। ততোধিক মহামূর্খ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, চাকুরে' বাবুরা রেলগাড়ীর জয়-গান গায়" বাজরে শিঙ্গা! বাজ এই রবে"র কবি হেমচন্দ্রও 'দোহার কী' দিয়াছেন, "শীঘ্র করি পরি' লহ ছড়ি ঘড়ি, তাজ কলিতে পুষ্পক রথ এনেছে ইংরাজ।" এ যে রাবণের পুষ্পক রথ সীতা হরণের জন্য তাহা কে বোঝে, কে বুঝায়? পল্লীমায়ের বক্ষপঞ্জর ডলিয়া, মাড়াইয়া বিধ্বস্ত করিয়া রেল লাইনগুলি ভারতের যে সমূহ সর্ব্বনাশ করিয়াছে ও করিতেছে তাহা দূর করিতে হইলে স্বায়ত্ব শাসন ব্যতিরেকে আর গত্যন্তর নাই। এই স্বায়ত্ত শাসন কোন শাসক সম্প্রদায় কাহাকেও কোনও দিন করুণা পরবশ হইয়া দয়া করিয়া দেয় নাই। ইংরাজও দেয় নাই। দেশীরাজও দিতেছে না। পল্লীবাসী তুমি যদি নিজের বলে নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া এ শক্তি অর্জ্জন করিতে না পার, দেশের শাসন ক্ষমতা, শাসননীতি নিজের কর্ত্তৃত্বাধীন করিতে না পার, তবে তোমার বুক ফাটা হাহাকারে সভ্য জগৎ, স্বাধীন দেশ, সব শুধু তোমাকে ঘৃণা করিবে এবং ইংরাজ মুচকি মুচকি হাসিবে। তোমার উদ্ধার তাহা হইলে বাঁচিয়া নহে, কেবল মরিয়া পোকা মাকড়ের মতো। বালক বালিকাদের 'রূপকথা'য় আছে—

যাদুপুরীতে এক মায়াবিনী রাক্ষসী লক্ষ লক্ষ রাজপুত্রকে মন্ত্রবলে ভ্যাড়া করিয়া রাখিত। পল্লীবাসী, ভারতবাসী রাজপুত্র রাজাধিরাজের বংশধর তুমি, আজ মায়াবিনীর মায়ায় ভ্যাড়া হইয়া তুমি এই মায়াও ছিঁড়িতে পারিতেছ না। তোমাদেরই মত আর এক রাজপুত্র বীর বলে যতদিন না তোমাদের এই মোহিনী মায়াকে জয় করিতে পারিতেছে ততদিন তোমাদের এই ভ্যাড়াত্ব ঘুচিতেছে না। কিন্তু সে বীর রাজপুত্র কই? সে যে তোমাদেরই আত্মনিহিত চৈতন্য শক্তি! তোমাদেরই আত্মপ্রত্যয়, দুর্জয় সংহতি শক্তি! আত্মচৈতন্য লাভ করিতে পারিলে মায়া প্রকৃতি তোমাকে আর শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবেনা—এ শিক্ষা, এই প্রাণদ মুক্তি মন্ত্র ভারতের সাংখ্যযোগ, বেদান্ত দর্শনাদি অন্ততঃ চারি পাঁচ হাজার বৎসর দিয়া আসিতেছেন। ভারতবাসী তোমার মুক্তি, আধ্যাত্মিক, বা রাজনৈতিক তোমার নিজের ত্যাগ সাপেক্ষ, নিজের আয়ত্তাধীন। রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রেও এই তত্ত্ব জানিয়া, বুঝিয়া কার্যে পরিণত করিয়া তুমি মৃত্যু, এই রাষ্ট্রনৈতিক মৃত্যুও এড়াইতে পারিবে। কল্যাণের আর পথ নাই। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" (১)

পল্লীমঙ্গলজনক, লোক কল্যাণকর এই সমস্ত ইষ্টাপূর্ত কর্মাদির জন্য খরচের কথা উঠিলে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার আর্থিক অস্বচ্ছলতার দোহাই বরাবর দিয়া আসিয়াছেন। এ দোহাই হিন্দুস্থান ভারত রাষ্ট্রেও আছে বটে, কিন্তু পাকিস্তানে ইহা অত্যধিক বেশী। কিন্তু এটা যে একটা অজুহাত তাহা সহজেই বোঝা যায়। এদিকে Nation building department বা জাতীয় কল্যাণকর বিভাগের জন্যই তাঁহাদের অস্বচ্ছলতা বা কৃপণতা। দেশরক্ষা মানে ভারতবাসীর অন্নবস্ত্র ঘর এবং শিক্ষার ও অর্থের সংস্থান। অন্নবস্ত্রের সংস্থান মানে জাতির মেরুদণ্ড কৃষক ও শিল্পী-

(১) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৮।৩।

কুলের আর্থিক অবস্থার উন্নতি। আর্থিক অবস্থার উন্নতি মানে কর ভার লাঘব করিয়া কৃষি শিল্পাদির সমুন্নতি। এই সমস্ত বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট সাধারণতঃ পরম কৃপণ, অতীব ব্যয়কুণ্ঠ ; কেবল কয়েকটী বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট 'দাতাকর্ণ'। "অর্দ্ধেক মা ষষ্টী, আর অর্দ্ধেক সব গুষ্টি"। পুলিস, সামরিক বিভাগ এবং রেলওয়ের জন্য অর্দ্ধেকের উপর খরচের ব্যবস্থা, আর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বয়ন, পূর্তকার্যাদির জন্য পিত্তিরক্ষা গোছের ব্যবস্থা। ভারতবাসীগুলো ভারী বখাটে, বেয়াড়া, বর্বর। তাহাদিগকে শাসনে রাখিতে হইলে পুলিস ও সামরিক বিভাগটা বেশ দৃঢ় ও মজবুত রাখা দরকার। ইংরাজ সরকারের আমলে সামরিক ব্যয় খুব বেশী করার প্রয়োজন ছিল ভারত বাসীকে পদানত রাখিবার চেষ্টায়, যাহাতে তাহারা ইংরাজ সরকারের সহিত ঝগড়া মারা মারি, মাথা ফাটাফাটি, রক্ত ছুটা ছুটি করিতে না পারে। আর হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের আমলেও সামরিক ব্যয় বেশী রাখিতে হয় হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের ষাঁড়ের লড়াই, গুণ্ডা গুঁতোগুঁতি ও খুনো ডাকাতদের রক্ত পিপাসা বন্ধ রাখিবার জন্য। দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের এই, এই ষণ্ডা মার্কা প্রকৃতির দরুণ পাকিস্তান রাষ্ট্রই বেশী দায়ী। মুস্লীমলীগ নেতারা "প্রত্যক্ষ সংগ্রামে" কলিকাতা নোয়াখালি প্রভৃতি নানাস্থানে রণকণ্ডুয়ণ প্রবৃত্তি ও ষণ্ডামার্কা প্রকৃতি না জাগাইলে বিহার, দিল্লী প্রভৃতি নানাস্থানে পাণ্টা রণকণ্ডুয়ণ প্রবৃত্তি ও ষণ্ডামার্কা প্রকৃতি অনেক হিন্দু নেতাদের মনে জাগিত না। মুস্লীম লীগ কর্তারা কাশ্মীরে ও নিজামের হায়দ্রাবাদে রণকণ্ডূয়ণ প্রবৃত্তির উস্কানী এতো না দিলে এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, ঘৃণা, দুই জাতি বিদ্বেষ ও বিভিন্ন স্বার্থের পরিঘাত না জাগাইলে উভয় রাষ্ট্রই মনের আনন্দে সামরিক ব্যয় কমাইয়া পল্লীমঙ্গলের নানাবিধ গঠনমূলক কার্য্যে অধিকতর অর্থ ও শক্তি বিনিয়োগ করিতে পারিতেন। সাধারণ পল্লীবাসী হিন্দু মুসলমানের এই কুকুড়ো ষাঁড়ের প্রকৃতি, শেয়াল

কুকুরের প্রবৃত্তি সাধারণত শান্তই থাকে এবং আছে। কিন্তু ইহাদের বুদ্ধি, রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা এবং দেশের ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর সমস্যা সমূহের সমাধান সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব খুবই বেশী। ইহাদিগকে অনেক নেতারা, অনেক খবরের কাগজ সম্পাদকেরা যে ভাবে মিথ্যা ও জাতি বিদ্বেষের পথে পরিচালিত করেন তাহাতে তাহারা পশু প্রকৃতির উপরে উঠিয়া যথার্থ মনুষ্য প্রকৃতির, দেবোপম ভাবের উপর সংস্থান করিতে পারে না। পশূচিত হিংস্র প্রকৃতি, ঝগ্‌ড়াটে প্রবৃত্তি আর রণ উন্মাদনা সংযত করিতে না পারিলে কেবল হিন্দুস্থান, পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রেরই সামরিক ব্যয়ভার বাড়িতে থাকিবে তাহা নহে, সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রেরই সামরিক ব্যয়ভার বাড়িতে থাকিবে। পৃথিবীর সব রাষ্ট্রনায়কেরা এবং তাহাদের দলীয় উপদলীয় ক্ষুদ্র নেতারা হিংস্র লড়ায়ে গরু বাঘ ভালুকের সাকরেদী করিতে থাকিলে পল্লীবাসী তুমি বাঁচিবে কি করিয়া? মরার ও মারার আয়োজন যেখানে অত্যধিক সেখানে বাঁচার ও বাঁচানর আয়োজন যে অত্যধিক কমিবে তাহাত স্বতঃসিদ্ধ। পল্লীবাসী হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদি, আরব তোমরা মরার জন্য বাঁচিবে, না, বাঁচার জন্য মরিবে, তাহা স্থির করিয়া তোমরা জাগো, ওঠো, প্রস্তুত হও। পাছে আমরা কাটাকাটি ফাটাফাটি করিয়া মরি তাই পরম দয়ালু, পরম সদাশয় গভর্ণমেণ্ট, হউন তিনি বৃটিশ হিন্দুস্থান বা পাকিস্তানী গভর্ণমেণ্ট, পুলিশ ও সামরিক বিভাগের ব্যয়টা কিছু বেশীই করেন। তাই গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসনেও চৌকিদারের মাইনে সমগ্র' ইউনিযন বোর্ড' এর খরচের প্রায় আট ভাগের সাত ভাগ। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে ২২৬০টী 'ইউনিয়ন বোর্ড' ৩২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা আদায় করিয়াছিল। তন্মধ্যে চৌকিদার প্রভৃতির মাহিনায় ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, আর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, পানীয় জল প্রভৃতির জন্য মাত্র ৫ লক্ষের কিছু বেশী খরচ হয়। সরকারী রিপোর্টই এই কথা বলেন। বাঙ্গলার অনেক পল্লীতে

স্বায়ত্ত শাসন (?) দান করা হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের বেসরকারী সভাপতি বা সভ্য কাহারও ক্ষমতা নাই যে সরকারের এই পোষ্য পুত্র চৌকিদারদের তাড়ায়। পল্লীতে জঙ্গলরাজি ব্রিটিশ রাজের কথা শুনিতে মোটেই রাজী নহে। তাহারা বিদ্রোহে গজগজাইয়া উঠিতেছে। পাকিস্তানে হিন্দুস্থানেও তাহারা তাহাদের আসর ছাড়িতেছে না। জলাশয়গুলি ইংরাজ রাজের বিদ্রোহী হইয়া ক্রমশঃ ক্রোধ তাপে শুকাইয়া গোষ্পদই হইয়াছে। চৌকিদারদের খবরদার সত্বেও চুরি ডাকাতি বাড়িয়াই চলিয়াছে। পাকিস্তানী বাংলায় ইহা অত্যধিক বাড়িয়াছে। এই চৌকিদারদের অসংখ্য কার্য। সে জঙ্গল গণনা করে, জলাশয়ের বর্ণনা করে, পল্লীবাসীর হওয়া মরার সংখ্যা রাখে, রামকে মারিয়া শ্যামকে বাঁচায়, প্রেসিডেণ্ট বা মাতব্বরের বাড়ীর কাছে কোন কোন রাত্রিতে এক আধবার হৈ চৈ করে, আর করে কর্তাদের, বড় কর্তা, মেজো কর্তা, সেজো কর্তা, ফুল কর্তা, ন কর্তা, ছোট কর্তা, কর্তাবাবু, কর্তা সাহেব প্রভৃতির চা-ক-রী অর্থাৎ menial services। পল্লীর এই চৌকীদারদিগেরই একটা একটা বড় বড় বা মোটা মোটা বা বড়তম মোটাতম সংস্করণই পুলিশ এবং সামরিক বিভাগের কর্তারা। এই সব কড়া কর্তাদের জন্যই যতো কড়াকড়ির দরকার। তাই গভর্ণমেণ্ট খরচের শিথিলতার কড়াকড়িটা চাপাইয়াছেন জাতি গঠন বিভাগের বা Nation building department এর ঘাড়ে, আর খরচের কড়াকড়ির ছড়াছড়িটা ছাড়িয়াছেন জাতিমরণ বা Nation killing department এর ঘাড়ে। অন্যান্য স্বাধীন দেশের পুলিশ এবং সামরিক কর্মচারীরা যেমন মারে তেমনি বাঁচায়, যেমন ভাঙ্গে তেমনি গড়ে। ভারতবাসীর ভাঙ্গা কপাল, ভাঙ্গা বুক, তাই তাহার ভাঙ্গাটাই কেবল সার হইয়াছে। আর ভগ্নকণ্ঠে এই ভাঙ্গার কাহিনী বলিতে গেলেও পিঠ ভাঙ্গে, মাথা ভাঙ্গে, সংসার ভাঙ্গে, গ্রামকে গ্রাম. দেশকে দেশ ভাঙ্গে।

পৃথিবীর সব দেশে সব কিছুই গড়ে বর্ধিত হারে, আর আমাদেরই কেবল সব ভাঙ্গে কেন? মিথ্যা ভগ্নদর্শন আমাদের শিখায় "আমাদের ভাঙা কপাল"। ভাঙা কপালের দোহাই দিয়া আমরা চোখ মেলিয়া দেখি না যে পৃথিবীর সব দেশ কেমন তাহাদের নিজ নিজ দেশের গম, চাউল, চিনি, তামাক, চা, কয়লা, বস্ত্র, মানুষ, বৈদ্যুতিক শক্তি সব গড়িতেছে বর্ধিত হারে। আর আমরাই কেবল হারিয়া যাইতেছি জীবনের অর্থনৈতিক সংগ্রামে। ভারত রাষ্ট্র বা পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সমুন্নত হইতে হইলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত সমতালে পা ফেলিয়া তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ও গুণবৃদ্ধি করিতে হইবে। সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন দ্রব্য ১০০ ধরিলে তাহার মধ্যে ভারতের স্থান :—

গম—রাশিয়াতে ৩০, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে—১৬, কানাডায়—১১, ভারতে ৭, ফ্রান্সে ৬, অষ্ট্রেলিয়ায় ৬, ইটালিতে ৫, জার্ম্মানীতে ৪, তুরস্কেতে ৩, জাপানেতে— ১, ইজিপ্টে ১।

চাউল—এশিয়াতে-৯৬, চীনে-৩৫, ভারতে-২৬, জাপানে-৯, ব্রহ্মদেশে-৬, তুলা—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে-৪১, ভারত-১৫, রাশিয়া-১৩, চীন-১১, ব্রেজিল-৭, ইজিপ্ট-৬,

চিনি—পৃথিবীর অপরাংশে-৮২, ভারতে-১৮, কিউবা-১৬, জাভা-৮ ফর্ম্মোজা-৭, ব্রেজিলে-৬,

চা—চীন-৪৯, ভারত-২৩, সিংহল-১২, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ-৯, জাপান ৬, তামাক—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে-২৮, ভারত-২২, রাশিয়া-১২

কয়লা—আমেরকা যুক্তরাষ্টে-২৯, বৃটেন-১৯, জার্ম্মানী-১৫, ফ্রান্স-৪ জাপান-৪, ভারত—২, বেলজিয়াম-২, চীন-১, দক্ষিণ আফ্রিকা-১, লোহা (আকরজাত) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র-৪৯, রাশিয়া-১৯, ফ্রান্স-১৩, সুইডেন-১১, বৃটেন-৫, জার্ম্মানী-৪, ভারত-২, নরওয়ে-১, অষ্ট্রেলিয়া-১।

ম্যাঙ্গানিজ—রাশিয়া ৫২, ভারত-১৬, জার্ম্মানী-৭, দক্ষিণ আফ্রিকা-৫, গোল্ডকোষ্ট-৪, ব্রেজিল-৩, জাপান-১।

শস্য—প্রতি একরে প্রতি হন্দরে (১০০ বা ১১২ পাউণ্ড) চাউল —জাপানে-৩০·৭, চীনে-২৫·৬, ইউ. এস্. এ-১৬·৮, ভারত-১৬·৫; গম—জাপান-১৩·৫, ইউ. এস্. এ-৯·৯, চীন-৯·৭, ভারতে-৮'১।

তুলা—(পাউণ্ডে) ইজিপ্টে ৩০০, চীনে-২০৪, ইউ. এস. এ-১৪১ ভারতে-১১০।

ইংলণ্ডে—১ একরে বৎসরে জন্মে—শস্য ২,০০০, আর ভারতে মাত্র ৬৯০ পাউণ্ড।

ইক্ষু—১ একরে বৎসরে জাভায় জন্মে ৪০ টন, আর ভারতে মাত্র ১০ টন।

তূলা—প্রতি একরে বৎসরে ইজিপ্টে ৪৫০ পাউণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২০০ পাউণ্ড, আর ভারতে মাত্র ৯৮ পাউণ্ড।

গোমহিষ—অবশিষ্ট পৃথিবীতে ৬৬⅔, আর ভারতে ৩৩⅓, দুগ্ধ অবশিষ্ট পৃথিবীতে-৮৮, আর ভারতে-১২।

মানুষের জীবন কাল—নিউজিলাণ্ডে-৬৭, নরওয়ে ও সুইডেন-৬৩, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে-৬২, বৃটেন ৬২, কানাডা-৬০ ফ্রান্স-৫৭, রাশিয়া-৪৫ জাপান-৪৩, ইজিপ্ট-৩৩, ভারত-২৭।

বৃটিশ যুগে খোদ ভারত সরকারের সামরিক খরচই প্রায় অর্দ্ধেক এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহাপেক্ষাও বেশী। প্রবল আন্দোলনের ফলে মাঝে সামরিক খরচ কিছু কমিলেও নিত্য দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশের পক্ষে যে তাহা অত্যধিক তাহা বলাই বাহুল্য। খোদ ভারত সরকারের বার্ষিক রাজস্বে আয় প্রায় একশত ত্রিশ বত্রিশ কোটী টাকা যুদ্ধের পূর্বে ছিল। ইহার মধ্যে সামরিক ব্যয় ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে ৫৫·১০ কোটী ১৯২১-২২; খৃষ্টাব্দে ইহা ছিল ৬৯·৮১ কোটি টাকা। পর পর বৎসরে সামরিক ব্যয় কিছু কমিলেও

১৯২৮-২৯ এ আবার কিছু বাড়িল। আর খাস বিলাতে ঐসময় পঞ্চাশ লক্ষ কমাইয়া সামরিক ব্যয় মাত্র চারি কোটী দশ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছিল। "ঢাল নাই, তরোয়াল নাই নিধিরাম সর্দার"। ভারতবাসীর ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, গুলি নাই, গোলা নাই, অথচ ভারতবাসীর সামরিক ব্যয় বিলাতের অপেক্ষা প্রায় ১৬৷১৭ গুণ বেশী। মজাইতো ওইখানে। কিছু পূর্ব্বে কয়েক বৎসরের ভারত গবর্ণমেণ্টের সামরিক ব্যয়ের তালিকায় দেখি বাজেট হিসাবে।

১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে	—	—	৬৯·৮১	কোটীটাকা	
১৯২২-২৩ "	—	—	৬৫·২৭	"	"
১৯২৩-২৪ "	—	—	৫৬·২৩	"	"
১৯২৪-২৫ "	—	—	৫৫·৬৩	"	"
১৯২৫-২৬ "	—	—	৫৬·০০	"	"
১৯২৬-২৭ "	—	—	৫৫·৯৭	"	"
১৯২৭-২৮ "	—	—	৫৪·৯২	"	"
১৯২৮-২৯ "	—	—	৫৫·১০	"	"

১৯৩৯-৪০ খৃঃ, সামরিক বিভাগের ব্যয় ৪৯·২৯ কোটি টাকা, অথচ এই সময় আয়ের বরাদ্দ ৮৭·৭৬ কোটি টাকা। ১৯৪০·৪১ খৃঃ সামরিক বিভাগের ব্যয় ৫৩·৫২ কোটি টাকা আর আয় ৮৫·৪৩ কোটি টাকা। ১৯৪৬-৪৭ খৃঃ দেশ রক্ষা বাবদে ২৪০·১১ কোটি টাকা ব্যয়। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বাবদে আয় ৩৩৬·১৯ কোটি টাকা। ইহা অন্তর্বর্তী ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্থ সচীব মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁর বাজেট হিসাব। ১৯৪৭, ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতার দিন হইতে ১৯৪৮, ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত সাড়ে সাত মাসে রাজস্ব খাতে ভারত গভর্ণমেণ্টের আয় ১৭১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা এবং দেশ রক্ষা খাতে ব্যয় ৯২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা; আর মোট ব্যয় ১৯৭ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। ১৯৪৭-৪৮ খৃঃ দেশরক্ষা খাতে মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ১৮৮·৭১ কোটি টাকা

কিন্তু এখানে ভারত গভর্ণমেণ্টের আয় ২৭৯'৪২ কোটি টাকা। ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারত সরকারের মোট আয় ২৩৫ কোটি ২ লক্ষ টাকা, আর ব্যয় ২৫৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে সামরিক খাতে ব্যয় ১২১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট আয়ের অর্ধেকেরও বেশী।

ভারতে রাজস্বের শতকরা প্রায় ৪২ অংশ সামরিক কার্যে ব্যয় হয়, আর তথাকথিত রক্ত লোলুপ—রেড্ রাশিয়ার (Red Russia) সামরিক ব্যয় তাহার আয়ের শত করা ১৪'৩ অংশ মাত্র। ১৯২৮ এর ৯ই মার্চ তারিখে কৌন্সিল অভ্ ষ্টেটে বক্তৃতা কালে অনারেবল শ্রীযুক্ত লোকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "Sir, if we add all these, the actual military expenditure, both open and concealed, we find it is not fifty five crores of rupees but at least 62 crores of rupees aud out of a a revenue of 132 crores" মহাশয়, আমরা যদি এই সমস্ত যোগ করি তবে প্রকাশ্য এবং গুপ্ত উভয় প্রকার প্রকৃত সামরিক ব্যয়, আমরা দেখিতে পাইব, ৫৫ কোটী টাকা নহে, অন্ততঃ পক্ষে তাহা ৬২ কোটী টাকা এবং তাহা ১৩২ কোটী টাকা রাজস্বের মধ্যে। সামরিক ব্যয় অতিকায় কি না, তাই তাঁহার খোরাকীটাও কিছু 'অতি'রকমের। উপবাসী ভারতবাসী ভারী হিংসুকে। ভারতের কাঠামটা ('Steel frame') বড় তাই তাহার সামরিক ব্যয়ও বড়। অন্যান্য দেশের সামরিক ব্যয়ের সহিত ভারত সরকারের এবিষয়ে অত্যধিক বাহুল্যের তুলনা কি অত্যধিক লজ্জা, ক্ষোভ এবং গ্লানির কথা নহে? ইংলণ্ড তাঁহার রাজস্বের শতকরা ১৪ ভাগ সমগ্র সামরিক রক্ষা কার্যে (defence এ) ব্যয় করেন—ইহার মধ্যে স্থল সৈন্য বিভাগে (army তে) শতকরা ৫, নৌবিভাগে (Navy তে) শতকরা ৭ এবং বিমান বিভাগে (Air force এ)

শতকরা ২। আমেরিকা ব্যয় করেন শতকরা ৭½; ফ্রান্স শতকরা ১০; ইটালী শতকরা ১০; জাপান শতকরা ১০½; জার্ম্মাণী শতকরা ৫। আর আজব দেশের অবাক কারখানা। ভারতের বরাতে শতকরা ৪২। আবার এই ৪২ এর মধ্যেও কারসাজি আছে। এই ৪২ অংশের মধ্যে যাহা ভারতবাসীর 'পোড়া কপালে' বন্টিত হয়, তাহা 'বিদুরের ক্ষুদকণা'। বিদুর বিশেষ দূরেই। ভারতে প্রায় ৫ দলে (unit এ) ৪,০০০ ব্রিটিশ অশ্বারোহী সৈন্যের জন্য সরকার ব্যয় করেন প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। তাহার পর ৪০,০০০ এর ৪৫ unit গোরা পদাতিকের জন্য সরকার ব্যয় করেন প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা; ১১৮¾ unit এ ৯৭,০০০ 'কালা' পদাতিকের জন্য মাত্র ৬ লক্ষ টাকা। ভারতীয় পদাতিকের মাথা প্রতি ব্যয় ৭৬৭; আর ব্রিটিশ পদাতিকের মাথা প্রতি ব্যয় ১,৬১৫৲ টাকা। রাজকীয় অশ্বারোহী গোলন্দাজ সৈন্যের (Royal Horse Artillery) ৭৬০ জন ব্রিটিশ সৈন্যের জন্য খরচ হয় ৭,২৭,৪১০৲ টাকা; আর ৪,০৫৯ জন এই জাতীয় দেশী সৈন্যের জন্য খরচ করেন মাত্র ১,২০,৬৯০৲ টাকা। এই বিভাগে গোরা রায়ের বরাদ্দ মাথা প্রতি ৯৭৫৲; আর 'কালা আদমী'র বরাদ্দ মাথা প্রতি মাত্র ২৬১৲ টাকা। তার পরে ৬০,০০০ ইংরাজের জন্য হাঁসপাতালে ব্যয় করা হয় ৭০,৪০,৫৬০৲; আর দুইলক্ষ ভারতবাসীর জন্য বরাদ্দ মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা। এই হাঁসপাতালগুলি যমের দোসরের ন্যায় পেচক গম্ভীর (হাঁসের মত নহে); নতুবা এই হাঁসপাতালগুলি সুরসিক হইলে এত দুঃখেও হাসিত। যমের দুয়ারেও কালা ধলায় পার্থক্য! তার পরে এই সৈন্যদিগের সন্তানদিগের শিক্ষা বিধানেও এই প্রচণ্ড পার্থক্য, বংশগত বিভীষণ ভেদ। ৫২০ জন (১৯২৮ এ) ব্রিটিশ বালকের 'লরেন্স রয়েল মিলিটারী স্কুলে' (Laurence Roya military School) শিক্ষা ব্যয় ৩,৭৬,

৫২০৲ টাকা আর ৫৭৪ জন ভারতীয় বালকের মাত্র ৭৬,০০০৲। সমস্ত স্কুলে ব্রিটিশ সৈন্যের জন্য শিক্ষা ব্যয় ১১,৫৬,০০০, টাকা; আর ভারতীয় সৈন্যের জন্য ১,১০,৪৫০৲ টাকা। কোয়েটাতে সামরিক কর্মচারীদিগের (Senior British officers) জন্য যে কলেজ (Staff College at Quetta) আছে তাহাতে বৎসরে প্রায় ৩০টী বৃটিশ সামরিক কর্মচারীর জন্য ৭,৩০,১২০৲ টাকা ব্যয় হইতেছে। মাথা প্রতি বরাদ্দ ২৪,৩৩৭৲ টাকা। কি সুন্দর ওর বরাদ্দ! আর ভারতবাসীর শ্রাদ্ধ। পল্লীবাসী তাহারই শ্রাদ্ধের উপকরণ যোগায় কিন্তু শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্রটাও পায় নাই।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ২২শে তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকাতে স্যার ডানিয়েল এম. হ্যামিলটন (Sir Daniel M. Hamilton) বেশ একটী সুন্দর পরিলেখ (diagram) আঁকিয়া সমগ্র ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের যে একটী একত্রিত ব্যয় লেখা দেখাইয়াছেন তাহাতেই সরকার বাহাদুরের বরাদ্দের বাহার ব্যপদিষ্ট হইয়াছে।

একশত ভাগের মধ্যে :—

সামরিক কর্মে—০·২৮, সাধারণ স্বাস্থ্যে—০·০১, জলসেচনে—০·০২, অরণ্যে—০·০২, ভূমিরাজস্বে—০·০২, বার্ধক্যভাতা ও পেনসনে—০·০৩, শিক্ষায়—০·০৫, সামাজিক (civil) কার্য্যে—০·০৫, সাধারণ কার্য্যে—০·০৬, পুলিশ, জেল ও বিচার—০·১০, ঋণ-কার্য্যে—০·১০, অন্যান্য কর্মে—০·১২, রেলওয়ে—০·১৪।

পল্লী-মঙ্গল মানে—পল্লীবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি, জল সেচনাদি দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতি, করভার লাঘব করিয়া প্রজার আর্থিক অবস্থা উন্নত করা; শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যাদি দ্বারা অর্থাগমের পথ অনুকূল করা, শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা জনসাধারণকে শিক্ষায় সমুন্নত করা ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলির বেলায় যদি স্বাধীনতার পরিবর্ত্তনের

যুগেও অনুরূপ পুঁটী মাছের তেল দিয়া পুঁটী মাছ ভাজার ব্যবস্থা করা হয় আর 'তেলো মাথায়' কেবল তৈল মর্দ্দন করা হয়—তবে পল্লীর গোটে মাঠে, হাটে বাটে আর আগমনীর বোধন ষষ্ঠী বাজিবে না, তাহার পরিবর্তে পল্লীর আকাশ বাতাস মাঠ ঘাট ভরিয়া কেবল বিজয়া দশমীর বিসর্জনই করুণ স্বরে কাঁদিয়া উঠিবে। হায় ভারত পল্লী, আবার কবে তুমি দশানন বিজয়ী রামচন্দ্রের বিজয়া দশমী উৎসব করিবে?

গোদের উপর এক 'বিষফোটে' রক্ষা নাই; তাহার উপর আর এক 'বিষফোট'। ভারতবাসী নাকি না খাইয়া মরে। দয়াময় গবর্ণমেণ্টের প্রাণ গলিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হওয়ার পর ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্থ-সচিব স্যার জন ষ্ট্রাচি 'Famine relief fund' বা দুর্ভিক্ষ নিবারক কর স্থাপন করিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে আর দুর্ভিক্ষ হইবে না। কর্ত্তারা বলিলেন এই কর কেবল দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পেই ব্যয়িত হইবে। ভারতবাসী ভাবিল এইবার বোধ হয় কামধেনুর কিছু দুধ তাহারা উপবাসের সময় পাইবে। কিন্তু "অভাগা যদ্যাপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়"। "সখিরে কি মোর করম লেখি। শীতল বলিয়া ওচাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি। উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে। লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল মানিক হারানু হেলে।" লক্ষ্মী চাহিতে দারিদ্র্যে বেড়িল এবং আরও কিছু অর্থ হারাইলাম। ব্যবস্থা হইল উল্টা। বেঙ্গল নাগপুর ও ইণ্ডিয়ান মিডল্যাণ্ড রেল কোম্পানী দুইটীকে ক্ষতিপূরণ বাবদে কর্ত্তারা দুর্ভিক্ষ নিবারক ভাণ্ডার হইতে চারিকোটী বিরানব্বই লক্ষ চারি হাজার টাকা দান করিলেন। ওরে মূর্খ ভারতবাসী, ক্ষুদ্র তুমি, তোমার ক্ষুধাও ক্ষুদ্র; ওরা সবাই যে অতিকায় রাক্ষস। তাই ওদের রাক্ষুসে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য বেশী খাদ্য চাই। তোমাদেরই শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে

—উপবাস পুণ্যজনক। উপবাস করিয়া তোমরা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়া স্বর্গ ভোগ কর। বঙ্গে, বিহারে, ভারতে ভয়ানক ছর্ভিক্ষ হইয়াছে; উড়িষ্যায় বিভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। দামামা, মাদল, জগঝম্প বাজিল, জয়ঢাক, আনকদুন্দুভি, কানাড়া, নাকাড়া তুরী, ভেরী গর্জিয়া ঘোষণা করিল ভীম ভীষণ দুর্ভিক্ষ; সেপাই-সান্ত্রী, লোকলস্কর, প্যায়দা বরকন্দাজ হাঁকিল, ডাকিল, ছুটিল, হাঁপাইল; অতার, বেতার, সুতারে বিশ্ব-দূত, মুক্তদূত, অবদূত বার্তাবহে শোকাবহ সৃষ্টি করিলেন; পাত্র, মিত্র, কোটাল, মন্ত্রী, ছোটকর্তা, নকর্তা, ফুলকর্তা, রাঙ্গাকর্তা, কালাকুত্তা (থুড়ি! থুড়ি! কর্তা কুত্তা নহে) ধলাকর্তা, সেজকর্তা, মেজেকর্তা, বড়কর্তা, কুঞ্জর গমনে "জিতি গমন কুঞ্জর" কুঞ্জ ভঙ্গ করিয়া নফরাদি সহ সফরে বাহির হইলেন। লক্ষ লক্ষ টাকা দুর্ভিক্ষ নিবারক কল্পে ব্যয়িত হইয়া গেল; আর ওই পেটপোড়া 'হাভাতে' দের লক্ষ লক্ষ পেটে যাইয়া পড়িল মাত্র দুই চারি হাজার টাকা, আর কাণে পড়িল বস্তায় বস্তায় মিঠো বুলির আওয়াজ ফাঁকা। সরকারী, আধা সরকারী কাগজে বিজ্ঞাপিত হইল দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইয়াছে; আর পোড়ার মুখো দেশী কাগজগুলো রটনা করিল—ভিক্ষা আর নেবে কে? প্রায় সব শেষ! দুর্ভিক্ষ নিবারণের ইহাই আধুনিকতম সংস্করণ। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা স্বাধীনভারত বা পাকিস্তান পায় নাই।

পল্লীর কৃষক কুলের বিরুদ্ধে এই সব শত্রু সৃষ্টি করিয়াই গভর্ণমেণ্ট থামেন নাই। কৃষক কুলের জমিগুলির টুকরা টুকরা বিলির ব্যবস্থা করিয়া তাদের সংহতি শক্তি পর্য্যন্ত লোপ করিয়াছেন। বিস্তৃত ভূমি খণ্ডের মালিক হইলে পাছে পরিশ্রমী অর্থশালী কৃষক-দিগের স্বাধীনতা স্পৃহা জাগিয়া উঠে, পাছে, তাহারা মাথা তুলিয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস পায়, তাই তাহাদের এই সংহতি শক্তি নষ্ট করিবার জন্য জমিদারদিগকে করভারে প্রপীড়িত

এবং কৃষক কুলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির মালিক করার ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। ইংরাজ রাজের এই নীতি প্রথম ব্যক্ত ও মুখরিত হয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যসম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্যে পার্লামেন্টের যে নির্দিষ্ট কমিটী বসে তাহার পঞ্চম রিপোর্টে (Fifth report of Select Committee of Parliament on the affairs of the East India Company—Appendix—pp 990—91)। পাঠকের অবগতির জন্য তাহা উদ্ধৃত হইল। "This quality of condition, in respect of wealth in land, this general distribution of the soil among a yeomanry, therefore, if it be not most adapted to agricultural improvement in the state of property, manners and institution which prevail in India, and it will be found still more adapted to the situation of the country, governed by a few strangers, where pride, high ideas and ambitious thoughts must be stifled. It is very proper that in England a good share of the produce of the earth should be appropriated to support certain families in affluence to produce senators, sages and heroes for the service and defence of the state or in other words that great part of the rent should go to an opulent nobility and gentry who are to serve their country in parliament in the army and navy, in the department of science and liberal professions. The leisure, independence and high ideas which the enjoyment of this rent affords, has enabled them to raise Britain to the pinnacle of glory. Long may they enjoy it ; but in India that haughty spirit, independence and deep thought which the possession of great wealth sometimes gives ought to be suppressed. They are directly adverse to our power and interest ..... we do not want generals, statesmen and legislators ; we want industrious husbandmen. Considered politi-

cally, therefore, the general distribution of land among a number of small proprietors who cannot easily combine against Government, is an object of importance". (Quoted in "Prosperous" British India by William Digby, P. 40.) থ্যাকারে আরও বলেন "If the ryots put on such a footing that their lands are saleable, and that they ought to pay whether they cultivate or not, the revenue will be secure". (ঐ Prosperous British India তে উদ্ধৃত। P 39.) জমি সম্পত্তি সম্বন্ধে এই ভাব, জোতদার সমূহের মধ্যে জমির অবস্থার এইরূপ সাধারণ বণ্টন, যদি কৃষি উন্নতির উপযোগী না হয়, তবে, তাহা ভারতের চলিত সম্পত্তির অবস্থা, ব্যবহার এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কল্পে সর্বাপেক্ষা উপযোগী হইবে এবং জন কয়েক মাত্র বিদেশী কর্ত্তৃক শাসিত সেই দেশের, যে দেশে গর্ব্ব, উচ্চ ধারণা এবং উচ্চ আকাঙ্খাপূর্ণ চিন্তাসমূহ অবশ্য চাপিয়া রুদ্ধ করিতে হইবে, সেই দেশের অবস্থার যে তাহা অধিকতর উপযোগী তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহা খুবই সমুচিত যে ইংলণ্ডে রাজ্যের রক্ষার এবং সেবার জন্য রাজ-মন্ত্রী, পণ্ডিত এবং বীরগণকে উৎপন্ন করিতে কতকগুলি পরিবারকে ধনশালী করিয়া রক্ষা করিতে, এই সব জমির উৎপন্ন দ্রব্যের উত্তমাংশ ব্যবহার করিতে হইবে। অথবা অন্য কথায় এই খাজনার অধিকাংশ ধনী সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়েরা এবং ভদ্রলোকেরা পাইবে যাহারা পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায়, স্থল জল সৈন্যদলে, বিজ্ঞান বিভাগে, এবং উন্নত ব্যবসায় সমূহে থাকিয়া দেশের সেবা করিবে। এই খাজনা তাহাদিগকে যে অবসর, স্বাধীনতা এবং উচ্চ ধারণা সমূহ দিতেছে তাহা ব্রিটেনকে গৌরবের শিখরে উঠাইতে সক্ষম হইয়াছে। প্রার্থনা তাহারা যেন দীর্ঘকাল ইহা উপভোগ করিতে পারে ; কিন্তু ভারতে সেই গর্ব্বিত ভাব, স্বাধীনতা এবং গভীর চিন্তা, যাহা প্রচুর ধনের অধিকারত্ব অনেক সময় দেয়, তাহা দমন করিতে হইবে। তাহারা স্পষ্টরূপে আমাদিগের প্রভুত্ব

এবং স্বার্থের বিরোধী......আমরা সেনাপতি, রাজনীতিজ্ঞ এবং আইন কর্ত্তা সকল চাহিনা; আমরা চাহি পরিশ্রমী কৃষক। অতএব রাজনীতিক বিবেচনাতেও একদল ক্ষুদ্র জোতদার দিগের মধ্যে—যে জোতদারেরা গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সহজে একদলবদ্ধ হইতে না পারে—এইরূপ জোতদারদিগের মধ্যে জমির সাধারণ বণ্টন একটী মূল্যবান অভিপ্রায়। রায়তেরা যদি এরূপ বন্দোবস্তে থাকে যে, তাহাদিগের জমি সকল বিক্রীত হইতে পারে এবং তাহারা চাষ করুক বা না করুক তাহাদিগকে খাজনা দিতেই হইবে, তাহা হইলে রাজস্ব নিরাপদ হইবে। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে জমি ভাগ করিয়া দেওয়ায় যে কৃষকদিগের সমূহ ক্ষতি তাহা লর্ড লিন্‌লিথগোর সভাপতিত্বে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যে কৃষি-কমিশন বসে তাহাতেও সাক্ষ্য দিবার কালে ২৯শে জুন তারিখে মিঃ. জে. এফ. কিটিং বলেন যে "আমার স্মরণ হয় দাক্ষিণাত্যে অনেক ভূমি দেখিয়াছি যাহা তার চতুর্দ্দিকস্থ গর-আবাদী জমি সকলের মধ্যে বিস্তৃত আকাশে এক একটী তারার মত দেখাইত।" তিনি আরও বলেন যে, "ভারতে যে প্রথায় কৃষকদিগের জমি বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়, তাহা ফসল উৎপাদনের পক্ষে ক্ষতিজনক। কারণ, ঐ সকল ক্ষুদ্র জোত বা জমির আকার ও পরিমাণ লাভ জনক নহে।"—বসুমতী ২৪শে আষাঢ়, ১৩৩৪। ইংলণ্ডের অল্প সংখ্যক লোকের জন্য যে ভারতের লক্ষ লক্ষ লোককে বলিদান দেওয়া হইয়াছে তাহা গভর্ণর জেনারেল স্যার জন শোর মহোদয়ের "Notes on Indian Affairs" (London, 1837, vol. II, p. 28) এতেও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। "The halcyon days of India are over. She has been drained of a large proportion of wealth she once possessed; and her energies have been cramped by a sordid system of misrule to which the interests of millions have been sacrificed for the benefits of the few."

অর্থাৎ :—ভারতের সে সুদিন আর নাই। ভারত যে ঐশ্বর্যের অধিকারিণী ছিল তাহার এক বৃহদংশই তাহার নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে। কয়েকজন মাত্রের উপকারার্থে লক্ষ লক্ষ লোকের স্বার্থ বলিদান করিয়া কুশাসনের জঘন্য রীতি দ্বারা তাহার সমস্ত শক্তি অবরুদ্ধ করা হইয়াছে। এই 'Sordid system of misrule' কুশাসনের জঘন্য রীতি ক্রমশঃ আরও Sordid বা জঘন্য হইয়াছে। মি: ডিগ্‌বি বলিয়াছেন যে এই কূট রাজনীতি ভারতের প্রত্যেক বড়লাট, ছোটলাট চীফ্‌ কমিশনার এবং তাঁহাদের অধীনস্থ রাজ কর্ম্মচারীগণের মূলমন্ত্র। এখনও এই মন্ত্র অনুসরিত হইতেছে। 'Royal Agricultural Commission' এর ফলে এই মূল মন্ত্রেরই পুরশ্চরণ ক্রিয়া যে সংসাধিত হইত তাহা মহাগর্দ্ধভ পল্লীবাসী কৃষককুল তখনও বুঝিতে পারে নাই। এই রয়্যাল কৃষি কমিশনের তদন্তের ফলে কৃষক কুলের প্রকৃত কল্যাণ না হইয়া পরম অকল্যাণই হইত; কিন্তু সুখের কথা তাহা কাজে পরিণত হয় নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত শত সহস্র রাজপুরুষের মুখমার্গ দিয়া যে আশ্বাস বাণী, যে সান্ত্বনার কথা, যে মোলায়েম বুলি বাহির হইয়াছে তাহা কার্যে আদৌ পরিণত হয় নাই; ইংরেজ রাজের প্রায় কোন প্রতিজ্ঞাই (Proclamation বা announcement) কার্যতঃ রক্ষা করা হয় নাই। হিন্দুস্থান এবং পাকিস্থানইবা কতখানি তাঁহাদের আচার প্রচারে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছেন ? পূর্ব পাকিস্তান বাংলায় তো আচারে ও প্রচারে অনেক তফাৎ দেখিতেছি। পাঠশালার বালকেরাও জানে যে মিথ্যাবাদী রাখালের সত্য কথাতেও কেহ বিশ্বাস করে না। আর এই ভারতের এবং বাংলার রাজনৈতিক বালকেরা, প্রবঞ্চিত দেশ বাসীরা মিথ্যাবাদীত্বের শত শত প্রমাণ পাইয়াও মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করিতেছে এবং ক্রমশঃ জাহান্নামে যাইতেছে। ভারতবাসীর এই অধঃপতন 'Paradise Lost' হইতেও

অধিক tragic বা বিয়োগান্ত। দুঃখের বিষয় কোন মিলটন (Milton) এই নূতন 'প্যারাডাইজ লষ্ট' লিখিল না বা লিখিতে পারিল না।

মূর্খ, দরিদ্র, নির্জীব পল্লীকৃষক জাঁতার মাঝখানে পড়িয়া দুই দিক হইতেই পিষ্ট ও প্রপীড়িত হইতেছে। সরকারের ঘূর্ণায়মান উপরিস্থ জাঁতা নিত্য নব ভাবে প্রমথিত করিয়া কৃষক কূলকে পরিক্লিষ্ট ও পরিক্ষীণ করিতেছে। সে কুটীল চক্র নিষ্পেষণ বিদ্যায় নব নব উন্মেষশালী। আর জাঁতার নিম্নস্থ চক্র জমিদার মহাজনাদিরা স্থাবর রূপেই কৃষক কুলকে নিষ্পেষিত হইতে সাহায্য করিতেছেন। ভীরু, দুর্ব্বল, বিলাসী, অর্থলোলুপ জমিদার মহাজনেরা জঙ্গমত্বশূন্য হইলেও তাঁহাদিগের ধৈর্য্য, লাথি ঝাঁটা খাওয়ার "তরোরিব সহিষ্ণু"তা, শাসন কর্তাদের অঙ্গমর্দন বা কর্ণমর্দনে "অমানিনা" ভাব আর গৌরাঙ্গ বা কালাচাঁদ রাজপুরুষ মাত্রেরই নিকট "তৃনাদপি স্থনীচ" দীনতা কৃষক কুলের সর্বনাশের নিম্নপ্রস্তর। বিলাসব্যসনে লিপ্ত, অমিতব্যয়ী জমিদার এবং সুদখোর মহাজন ও ব্যবসাদারদের প্রবল নিষ্পেষণে পড়িয়া দুর্বল দরিদ্র তাহার অন্নসংস্থান করিতে পারিতেছে না। ইহাদিগের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে বিদ্রোহী কঠিন শস্যদানার ন্যায় উভয়ের মধ্যস্থল হইতে পল্লীবাসীকে, বিশেষতঃ কৃষক কুলকে দূরে ছিটকাইয়া পড়িতে হইবে। এইজন্য কৃষক পল্লীবাসী, চাষী ভাইদিগের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধভাব উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। কোনও প্রবল শক্তি যখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে ক্ষুদ্রের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয় তখন ক্ষুদ্রের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে ক্ষুদ্রকেও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। এই বিংশ শতাব্দীতে যে জাতি, যে সম্প্রদায়, যে মানব সমষ্টি যত জোট বদ্ধ বা সংঘবদ্ধ তাহা ততই শক্তিশালী ও দুর্বার। পল্লী কৃষককে শক্তিশালী হইতে হইলে তাহাকেও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। যথার্থ পরিপূর্ণ স্বরাজ লাভ করিতে হইলে দেশের নেতাদিগকেও সর্ব প্রথম এই কৃষক ও শ্রমিকদিগের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধভাব আনয়ন করিতে হইবে। কংগ্রেসের

এবং বর্ত্তমান রাষ্ট্রনায়কদের সবপ্রথম কর্তব্য সমবায় প্রণালী বা 'সম্ভূয় সমুত্থান' প্রণালীতে এই কৃষক দিগের মধ্যে একতা বা সমষ্টি শক্তির উদ্বোধন। কৃষকের এই সমষ্টি শক্তি কংগ্রেস বা কোন জাতীয় মহাসমিতির পৃষ্ঠে থাকিলে সরকারকে 'যুদ্ধং দেহি' বলিতে পারে। ইহা ছাড়া আর সব ফাঁকা আওয়াজ। সরকারও ইহা বেশ জানেন। তাই স্বদেশী পাণ্ডাদের কৌন্সিলে তাল ঠোকাঠুকি, লাফালাফি, তর্জন গর্জন তাঁহারা অজযুদ্ধ বা নাটকাভিনয়ই মনে করেন। কৃষক শক্তি পশ্চাতে রাখিতে পারিলে যে নেতাদিগের শক্তি দুর্জয় হইবে, তাহা অনেক কৃষক নেতাও উপলব্ধি করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিষম প্রমাদে ভ্রান্ত হইতেছেন। তাঁহারা দেশীয় জমিদার মহাজনদিগকেই প্রধান শত্রু মনে করিয়া সরকার শত্রুর সহিত সহযোগিতা করিয়া এই জমিদার মহাজন শত্রুদিগকে উৎসাদিত করিতে চাহিতেছেন। সরকার বাহাদুরও ভেদনীতি দ্বারা চালিত হইয়া স্থানে স্থানে প্রজাবন্ধুরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। মূর্খ প্রজারা এই অন্তর্নিহিত মতলব বুঝিতে পারিতেছে না। বঙ্গীয় প্রজার দশা ঠিক মারীচের ন্যায়। হয় রামের হাতে নতুবা রাবণের হাতে মৃত্যু অনিবার্য। সরকার বাহাদুর যে সর্বত্র রাম নয় তাহা প্রজাকুল বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। সমগ্র পল্লীকৃষক কখনও জমিদার বা মহাজন হইতে পারিবে না অন্ততঃ বর্তমান সমাজপদ্ধতি, রাষ্ট্রপদ্ধতির সম্পূর্ণ উলট্ পালট্ হইয়া যথার্থ সমাজতন্ত্রবাদের ন্যায় কোনও সাম্যবাদের অভ্যুত্থান না হওয়া পর্যন্ত। এই সব কালা জমিদার ও মহাজনের পরিবর্তে কৃষক কুল এক বিদেশী জমিদার ও মহাজনের কবলে পড়িবে এবং ক্রমশঃ পড়িতেছেও। এই যে এক এক দুর্ভিক্ষে কৃষকেরা লাখে লাখে সরকারী ঋণ গ্রহণ করিতেছে ইহার পরিণামে সরকারই এই কালা মহাজনের স্থান দখল করিতেছেন। একবার কৃষক কুল এই সরকারী ঋণে আবদ্ধ হইলেই তাঁহারা সম্পূর্ণ সরকারের

কুক্ষিগত হইলেন। সব মহাজনই 'মাকালী'। তাঁহারা টাকা কর্জ দিবার সময় দুই হাতে খুব 'বর' এবং 'অভয়' দেন বটে, কিন্তু পরে এক হাতে খাঁড়া আর এক হাতে খাতকের মাথা। খাতক এখন ঘাতকের পাল্লায়। নব দেশী ঘাতক যে কৃপা পরবশ হইয়া 'আসল' টাকাও ছাড়িয়া দিবে এ ভ্রান্ত বিশ্বাস বিকৃত মস্তিষ্ক পাগলেও করে না। পল্লী কৃষকের মস্তিষ্ক বিকৃত, পর্যুষিত না হইলে কি তাহার এইরূপ ভ্রান্তি প্রমাদ হইতে পারে! কালা গ্রাম্য জমিদার মহাজন হাজার শত্রু হইলেও সে সহস্র সম্পর্কে, সহস্র বন্ধনে তাহার দেশবাসীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া সুখে দুঃখে কালা জমিদার, মহাজন কালা প্রজা, খাতকের প্রতিবেশী হইয়া রহিয়াছে। বহুকাল সে প্রজাবন্ধু রূপেই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। এখন যে সে স্থানে স্থানে প্রজাশত্রুরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণও ঐ বৈদেশিক দিগের প্রবল নিষ্পেষণ। যে ধনিক ধলা বা কালা সরকার গোটা ভারতকে দুর্দশার চরম সীমায় আনিয়াছে এবং-আরও আনিতে চেষ্টা করিতেছিল ধনতান্ত্রিক অতিলোভে এবং যে কালা সরকার সেই পথই প্রকারান্তরে অনুসরণ করিতেছে ধনতান্ত্রিক অতিলোভকে কঠোর ভাবে দমন না করিয়া, বরং নেপথ্যে প্রশ্রয় দিয়া, সেই ধলার চেলা কালা সরকাররাও যে হঠাৎ দয়ার সাগর হইয়া মহাজন জমিদাররূপে গোটা ভারতের এক অংশের লোকের উপর কৃপা কটাক্ষ করিবে—ইহা বালকের বাচালতা, বাতুলের প্রলাপ, ঘৃনিত দাস জাতির বিকৃত মস্তিষ্কের উদ্গার। কৃষক কে তোমার রাম, কে তোমার রাবণ চিনিলে! কৃষক তোমার জাতীয় অভ্যুত্থান এই স্বদেশী জমিদার, শিল্পপতি,মহাজনাদির সঙ্গে প্রথমতঃ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া। যদি প্রায় ছয়শত ভারতীয় ে শী সামন্তরাজ এবং দেশীয় নৃপতিদিগকে প্রজাতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক দেশহিতৈষীরূপে রূপান্তরিত করিয়া ভারত রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতায় অবতীর্ণ করান যাইতে পারে, তবে

জমিদার, মহাজন, শিল্পপতিদিগকেও তাহা করান যাইতে পারে। রাজগৌরব আর জমিদারী গৌরবের পোষ্য পুত্রেরা ক্ষমতার ও প্রভুত্বের অপব্যবহার অনেক করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রজার মঙ্গলও যে যথেষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাদের আমলে কৃষক প্রজারা যে খুবই সমৃদ্ধ ছিল ইহা যেন জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের মোহে আমরা ভুলিয়া না যাই। সমস্ত রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ধার্মিক প্রথাই কালে কালে নানা অনিষ্টের আকর হইয়াছে প্রয়োগ কর্তাদের, ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত চরিত্র এবংজীবনের অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও চরিত্রহীনতাদিজনিত অব্যবস্থার ফলে। ইহা যে জমিদারী প্রথা বা জমিদার তান্ত্রিক সমস্যা মাত্র নহে, তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। রাজগোষ্ঠী বা জমিদার গোষ্ঠী কেবল মন্দ আর কু হইলে তাহাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর এতো শক্তি থাকিত না, যাহার লোভে বিদেশী বণিকেরা দলে দলে পঙ্গপালের মতো বাংলার ও ভারতের প্রচুর শস্য শ্যামল রাজ্য বা জমিদারী ক্ষেতে আসিয়া আসন গাড়িয়া বসিয়াছিল। আসল সমস্যা অত্যধিক ধন লোভের বা 'ম্যামনিজম' (Mammonism) বা কুবের বাদের নৈতিক চরিত্রহীনতা। পূর্ব বাংলায় আজ সেই রাজতন্ত্র ও জমিদার তন্ত্রের যায়গায় মুশ্লীমলীগ তন্ত্র হয়তো গায়ের জোরে হইবে এবং পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতরাষ্ট্রে কংগ্রেসতন্ত্র হয়তো ভোটের জোরে হইবে। কিন্তু যদি সেই প্রভু গোষ্ঠীর নৈতিক চরিত্রশক্তি ধন লোভকে জয় করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে বড় মানুষ হইবার ও প্রভুত্ব করিবার মদ ও মোহকে দমন না করে, তবে রাজতন্ত্র ও জমিদারী তন্ত্রের পূর্বের শালের কাঠাম বদলাইয়া মাত্র অগাছার কাঠাম গড়া হইবে। ৺রবীন্দ্রনাথও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ এদিকে করিয়াছেন। "পূর্বতন রাজ গৌরব লোলুপেরা যখন এদেশে রাজত্ব ক'রতো তখন এদেশে অত্যাচার, অবিচার অব্যবস্থা ছিল না একথা বলা চলেনা। কিন্তু তা'রা ছিল এদেশের

অঙ্গীভূত। তাঁদের আচড়ে দেশের গায়ে যা ক্ষতি হ'য়েছিলো তা ত্বকের উপরে, রক্তপাত অনেক হ'য়েচে, কিন্তু অস্থি বন্ধনী গুলোকে নড়িয়ে দেয়নি। ধন উৎপাদনের বিচিত্র কাজ তখন অব্যাহত চ'লেছিলো; এমন কি নবাব বাদশাহের কাছ থেকে সে সমস্ত কাজ প্রশ্রয় পেয়েছে। তা যদি না হ'ত তা হ'লে এখানে বিদেশী বণিকের ভিড় ঘটবার কোনো কারণ থাকতো না—মরুভূমিতে পঙ্গপালের ভিড় জ'মবে কেন?

তার পরে ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের অশুভ সঙ্গমকালে বণিক রাজা দেশের ধন কল্পতরুর শিকড় গুলোকে কী ক'রে ছেদন ক'রতে লাগ্‌লেন-সেই ইতিহাস শতবার কথিত এবং অত্যন্ত শ্রুতিকটু। কিন্তু পুরাতন ব'লে সেটাকে বিস্মৃতির মুখঠুলি চাপা দিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা চ'ল্‌বে না। এদেশের বর্তমান দুর্ব্বহ দারিদ্র্যের উপক্রমণিকা সেইখানে। ভারতবর্ষের ধন মহিমা ছিল, কিন্তু সেটা কোন্ বাহন যোগে দ্বীপান্তরিত হ'য়েচে সে কথা যদি ভুলি তবে পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসের একটা তত্ত্বকথা আমাদের এড়িয়ে যাবে। আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণাশক্তি বীর্য্যাভিমান নয়, সে হ'চ্চে ধনের লোভ, এই তত্ত্বটী মনে রাখা চাই। রাজ গৌরবের সঙ্গে প্রজাদের একটা মানবিক সম্বন্ধ থাকে কিন্তু ধনলোভের সঙ্গে তা থাকৃতেই পারে না। ধন নির্ম্মম, নৈর্ব্যক্তিক। যে মুরগী সোনার ডিম পাড়ে লোভ যে কেবল্ তার ডিমগুলোকেই ঝুড়িতে তোলে তা নয়, মুরগীটাকে সুদ্ধ সে জবাই করে।

বণিক রাজের লোভ ভারতে ধন উৎপাদনের বিচিত্র শক্তিকেই পঙ্গু ক'রে দিয়েচে। বাকী রয়েচে কেবল কৃষি, নইলে কাঁচামালের জোগান বন্ধ হয় এবং বিদেশী পণ্যের হাটে মূল্য দেবার শক্তি একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়। ভারতের সদ্যঃপাতী জীবিকা এই অতি ক্ষীণ বৃন্তের উপর নির্ভর ক'রে আছে।"—রাশিয়ার চিঠি,

উপসংহার, ৺রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮-১৪০ পৃঃ। বিদেশী ধনলোভের শোষণে রাজতন্ত্র ও জমিদারতন্ত্র নানাভাবে যে রক্তশূন্য হইয়া দুষ্ট হইয়াছে তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

তন্ত্রের দোষ যতো থাকুক বা না থাকুক, তান্ত্রিকের বা তন্ত্রের সাধকের দোষ যদি বেশী থাকে, তবে তাহাতেই আনে মানুষের সকল রকমের অকল্যাণ, সর্ব্বনাশ। তান্ত্রিক সাধক ভাল হইলে তাঁহারা তন্ত্রের দোষ সংশোধন করিয়া লন। রাজতন্ত্রের বা সামন্ত-রাজতন্ত্রের মধ্যে অনেক গলদ, দোষ ঢুকিয়াছিল দুষ্ট বিদেশী শাসন-তন্ত্রের দুষ্টামি বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া নিজেদের চারিত্রিক দুর্ব্বলতা সমূহ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া। আজ স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের উপযুক্ত নেতা সর্দার বল্লভ-ভাই প্যাটেলের সর্দারীতে আর নেতৃত্বে প্রায় ছয় শত বার (৬১২) দেশীয় রাজতন্ত্র এবং ইহার মধ্যে কাশ্মীর, হায়দারা-বাদ রাজতন্ত্র পর্যন্ত, গণতান্ত্রিক ও প্রজামঙ্গলকর রাজতন্ত্রে পরিণত হওয়ায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে রাজতন্ত্রকেও যুগোপযোগীভাবে সংশোধিত করিয়া লইলে তাহাও মঙ্গলপ্রসূ ও প্রজাকল্যাণকর হইতে পারে। উপযুক্ত চালকের নেতৃত্বে রাজতন্ত্রও যদি প্রভূত মঙ্গলপ্রসূ হইতে পারে, তবে অনুরূপ নেতৃত্ব পাইলে জমিদার তন্ত্রও কেন প্রজার মঙ্গল-প্রসূ হইতে পারিবে না ? ছয়শতাধিক রাজতন্ত্রকে রক্ষা ও পরিচালিত যেভাবে করা হইয়াছে, তাহাপেক্ষাও সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে জমিদার তন্ত্রকে পরিচালিত ও রক্ষা করিলে তাহাও যথেষ্ট কল্যাণপ্রসূ হইতে পারে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া জমিদারী সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে মাথা-প্রতি বণ্টন করিলে কি দুর্দ্দশা হইবে তাহা অনুধাবন করা যাউক।

(১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য যে পার্লিমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট কমিটি বসে, তাহার পঞ্চম রিপোর্ট পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। (৭৯-৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য) তাহাতে উল্লিখিত জমিদারী প্রথার ও

অন্যান্য সুবিধা সমূহ এই :—(ক) জমিদারেরা অর্থশালী হইলে তাহারা স্বাধীন, গর্বিত, দাসত্ব সহনে অসহিষ্ণু হইবে; (খ) তাহারা গভীর চিন্তা ও উচ্চ ধারণা সমূহ দ্বারা দেশ ও রাষ্ট্রের সেবা করিতে পারিবে। (গ) তাহারা রাষ্ট্র সভায় বড় বড় স্থানে অধিষ্টিত হইতে পারিবে, স্থলজল বিমান সৈন্যদলে, উন্নত শিল্প, ব্যবসাদিতে নিজে উন্নত হইয়া ধনোৎপাদন করিয়া রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ করিবে। জমিদারী-প্রথা লোপ করিলে এই সমস্ত সুবিধা হারাইতে হইবে। (২) ইহাতে কৃষকের দুর্দ্দশা ঘুচিবে না। পশ্চিম বঙ্গ ধরিয়াই বিচার করা যাউক—পশ্চিম বঙ্গের মোট লোকসংখ্যা ২,১১,৯৪,৬১৩; মোট জমির পরিমাণ ২৮, ৪৩৩, বর্গ মাইল; মোট চাষের জমি ১৬,১১৩ বর্গ মাইল; আবাদ যোগ্য পতিত জমি মোট ২, ৬১১ বর্গ মাইল। মাথা প্রতি উহা বণ্টন করিলে প্রতি চাষী আবাদী জমি পাইবে ·৪৯ একর অর্থাৎ দেড় বিঘার কিছু কম। সমস্ত আবাদী ও আবাদ করিবার উপযুক্ত জমি বণ্টন করিলে মাথা পিছু পড়িবে ·৫৭ একর বা পৌনে দুই বিঘার কিছু কম জমি। তাহাতে ধান জন্মিবে গড়পড়তায় ৭।৮ মণ। বৎসরে উহাতে ৫ মণ চাউল হইবে। পেট ভরিয়া খাইতে গেলে বৎসরে অন্ততঃ ১৮ মণ চাউল জনপ্রতি লাগে। সেখানে পাঁচ মণে সিকি ভোজন অর্থাৎ চারি দিনে তিন দিন উপবাস। প্রত্যেক কৃষক বা জন এই মাথা-প্রতি দেড় বিঘা বা দুই বিঘা জমি লইয়া ভাত, কাপড়, ঘরের ব্যবস্থা কতটুকু করিতে পারিবে? চার দিনে তিন দিন উপবাসী, কাপড়, ঘর, রোগে চিকিৎসা, শিক্ষার ব্যয় মানুষ হবার উপায় কি দিয়া করিবে? তাহাকে প্রধানত শিল্প ব্যবসায়াদি অন্য অর্থোপার্জ্জনের পথ গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল এই অর্থ নৈতিক কারণেই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে জমি ভাগ করার ফল মঙ্গলপ্রসূ হইবে না। (৩) সমবায় প্রথায় চালাইলেও তাহাতে কুলাইবে না। আর তাহাতেও সমবায় জমিদারী হইবে, যাহার কর্তৃত্ব ও মুনাফা

শিকার ম্যানেজিং এজেন্ট বা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে যাইবে। তাহাতে প্রজা সাধারণের দুঃখ, দৈন্য, অন্নকষ্টাদি ঘুচিবে না। কৃষককেও যখন শিল্প ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করিতেই হইবে, তখন জমিদারগণকে ক্ষতিপূরণের যে কোটী কোটী টাকা দেওয়া হইবে, তাহা দিয়া শিল্পাদির প্রসারের চেষ্টা করিলে তাহাতে প্রজার আয়ের একটা উপায় হইবে। (৪) জমিপতিদের উচ্ছেদ করিলে শিল্পপতিদের উচ্ছেদের প্রশ্নও উঠিবে। ধনিকদিগকে বা ধনপতিদিগকে উচ্ছেদের প্রশ্নও মাথা চ্যাঙ্গাইয়া উঠিবে. যাহা বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যোৎপাদন কমৃতির যুগে করিলে, মারাত্মক অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হইবে—যাহার সম্মুখে পড়িয়া কৃষক, প্রজা আদি সবাইকে অগাধ জলে হাবুডুবু খাইতে হইবে। (৫) বর্তমান যুগে তন্ত্রের দোষ দেওয়া রেওয়াজ হইয়াছে। তাহা হইতে মুক্ত দর্শন, দৃষ্টি ফিরাইয়া তান্ত্রিক, সেই সব তন্ত্র-বাদের ধারক, বাহক শিষ্যদের মানবতান্ত্রিক ও চরিত্রতান্ত্রিক গুণাবলী উন্মেষের দিকে দর্শন ফিরাইলেই যথার্থ গণমঙ্গল, প্রজা কল্যাণ সহজ হইবে। (৬) 'ম্যামন' 'কুবের' এর শিষ্য যখন প্রায় সকলেই, প্রায় সবাই যখন ধনলোভী, তখন জনসাধারণের মন হইতে এই অত্যধিক ধনলোভ বা কুবেরের পূজা দূরীভূত না হইলে, কুবেরের প্রভু, দেবতা ল্যাংটা, বুনো শিবের, শুভের আগমন ও জয়যাত্রা সম্ভব হইবে না। ধনলোভ ধনিক জমিদারকে উচ্ছেদ করিয়া ধনিক শিল্পপতি, বোমা-বিজ্ঞানপতি, রাষ্ট্রপতিতে মাত্র পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হইবে। জমিদার হইবেন খনিদার, আড়তদার, কারখানাদার, ব্যবসাদার, ব্যাঙ্কদার, কালাবাজারদার, মুনাফা-শিকারদার ইত্যাদি। তাই উপনিষদের সনাতন উপদেশ "মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনং তেনত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" (ঈশ, ১)। কাহারও ধনে লোভ করিও না। আত্মবলে বলীয়ান হইয়া ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর।

জমিদার প্রজায়, ধনিকে শ্রমিকে, নিয়োগকারী ও নিযুক্তদের

শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিবাদ, মারামারি, খুন ডাকাতী বাধাইয়া, রক্ত দুর্দশার হোলি খেলার রঙ্গে, প্রতিহিংসার রণকণ্ডুয়ন প্রবৃত্তিতে স্নাত ও রঞ্জিত হইয়া কোন্ শ্রেণীহীন সমাজ গড়িবে তোমরা ক্রেমলিনের তের কর্তার বা এক মহাকর্তার রাষ্ট্রতন্ত্রের আদর্শে? সমাজতান্ত্রিকেরাও এবং সাম্যবাদীরাও যদি ধনলোভী, ভোগবাদী, বিলাসব্যসনে অত্যধিক অমিতব্যয়ী হন, তবে তাঁহাদেরও তো ধনলোলুপতায় ধনিক হইবার যথেষ্ট সখ আছে। যখন বহু ধনের উপর কর্তৃত্ব করিবার দুর্লোভে তাঁহারা যথেচ্ছাচারী এবং অত্যাচারীও হন 'ডিক্টেটর' রূপে, লক্ষ লক্ষ লোককে দারুণ দুর্দশায় পর্য্যন্ত ফেলেন নিজেদের স্বার্থ হাঁসিল করিতে, তখন অপরের তন্ত্রে শত ছিদ্র দেখাইবার সার্থকতা ও কার্যকারিতা তাঁহাদের কী আছে? চালুনী ঝাঁঝরাকে যদি বলেন তোমার পাছায় শত ফুটো, তবে চালুনীকে পাল্টা জবাবে ঝাঁঝরা বলিবে তোমার ফুটো শত শত। এই ভাবে চলিবে তর্কের লড়াই, বাচিক সংগ্রাম, আর পরিণামে সশস্ত্র সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন বলি, ঘর সংসারের শ্মশান চিতাভস্মে পরিণতি, দেশকে দেশ জ্বালাইয়া, বোমায় বিধ্বস্ত করিয়া হাহাকারের সাহারা মরুরচনা। সকলেরই ধনলোলুপতা সংযত করিলে এতো অনর্থ, দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম, সর্বগ্রাসী যুদ্ধ আসে না। তাই সর্বপ্রকার তন্ত্রবাদী তান্ত্রিকদের চরিত্র শোধন, আত্মশোধনের প্রয়োজন অত্যধিক জাগিতেছে। মানবতার, বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রচারের পুঁথি, কাগজের কলেবর হইতে কবে মানব জীবনে, মানবের দেহ মনে মতবাদে মূর্ত, বিগ্রহবান্ হইবে? আয়ার্লণ্ড ও ইংলণ্ডে হাজার ঝগড়া থাকিলেও প্রথম জার্মান যুদ্ধে ইহারা ঘরোয়া বিবাদ মিটাইয়া একসঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে। পরে যুদ্ধে জিতিয়া আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের নিকট তাহার প্রাপ্য আদায় করিয়াছে ও করিতেছে। এই জমিদার ও মহাজনের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাঙ্গলার

কৃষককুল অন্ততঃ একটা বিষয়ে সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিতে পারে। এই একটা বিষয়ে যদি কৃষক ও জমিদার, খাতক ও মহাজন, ধনিক ও শ্রমিক পরস্পরের লাভ ও স্বার্থের জন্যই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করেন, তবে সফলতা লাভের পর কৃষক, শ্রমিক খাতকেরাও তাহাদিগের ন্যায্য দাবী জমিদার, শিল্পপতি ও মহাজনের নিকট হইতে সহজে আপন শক্তি বলেই গ্রহণ করিতে পারিবে এবং জমিদার, শিল্পপতি এবং মহাজনেও আপনাদিগের স্বার্থের অনুকূল বুঝিয়া তাহাতে সম্মতি দিবে। বিদেশী তৃতীয় পক্ষকে প্রাঙ্গন হইতে সরাইয়া দিলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া অনেক সময়েই সহজে মিটিয়া যায়। যে তৃতীয় পক্ষ কোটনার ভাইতে ভাইতে ঝগড়া বাধাইলে লাভ আছে, সে তৃতীয় পক্ষ এ ভাইয়ের পক্ষ একবার ও ভাইয়ের পক্ষ একবার অবলম্বন করিয়া ঝগড়াটা আরও জটিল ও ভীষণ করিয়া তোলে। এই বিদেশী তৃতীয় পক্ষকে জমিদার ও কৃষক, ধনিক ও শ্রমিক মহাজন ও খাতকের মাঝখান হইতে সরাইয়া দিতে পারিলে ইহাদের বিবাদ সহজেই মিটিয়া যাইবে। তাই জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিতে হইলে বাঙ্গালার কৃষক জমিদার, ধনিক শ্রমিক, খাতক মহাজনকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আত্মকর্তৃত্ব লাভের জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে। বঙ্গীয় কংগ্রেস যদি এই ব্যাপারে পুরোহিতের কার্যে নিযুক্ত হন, তবে সমস্যা সহজ হইয়া আসিবে। সাম্প্রদায়িক মুস্লিমলীগের বর্ত্তমান কর্তৃত্ব পাকিস্তানে ও বাঙ্গালাতে হিন্দু নির্যাতনে ও হিন্দু শোষণে ইংরাজদের সহযোগী হওয়ায় এবং চার্চিলের সাহায্য ভিক্ষা করায় তাহারও দুর্বলতা ও পরিণামে ব্যর্থতা অনিবার্য।

বাঙ্গালার পাটের কারবারটা যদি একটি নিখিল বঙ্গ সমবায় সমিতি বা All Bengal Jute Association প্রত্যেক পল্লীর কৃষক সমবায় সমিতি বা পল্লী সমবায় সমিতির কেন্দ্র রূপে চালাইতে পারেন, তবে এই একটা বিষয়ের সফলতা দ্বারাই জাতীয় আত্মকর্তৃত্বের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। ইহাতে জমিদার মহাজনেরাও যথেষ্ট

লাভবান্ হইবেন এবং কৃষকেরাও ঘরে বসিয়া পাটের মূল্য তিনগুণ চারিগুণ বেশী পাইতে পারেন। যাহারা অর্ধাঙ্গ জলে পচাইয়া, মশা জোঁকে জর্জরিত হইয়া পাট প্রস্তুত করে, তাহারা যে তিমিরে সে তিমিরে, আর বিদেশী ধনী ব্যবসাদারেরা ইহাকে প্রায় একচেটিয়া করিয়া 'টাকার কুমীর' হইতেছে। পৃথিবীর মধ্যে পাট খুব বেশী একমাত্র বাঙ্গালাদেশেই উৎপন্ন হয়। সর্ব দেশের লোকের নিকটেই পাটের চাহিদা (demand) খুব বেশী। পাট রপ্তানীর শুল্ক হইতে বৎসর বৎসর পূর্বে পৌনে চারি কোটী টাকা হইতে নয় কোটী টাকা আদায় হইত। ১৯৪৬-৪৭ সালে প্রায় ৭।৮ কোটী টাকা আর ১৯৪৭-৪৮ সাল প্রায় ৯½ হইতে ১০½ কোটী টাকা পাওয়া গিয়াছে। হিন্দুস্থান বা পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট এই পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের পাটের টাকা সম্পূর্ণ প্রাদেশিক কল্যাণে কেন নিয়োজিত করেন নাই?

	১৯৪৪-৪৫	১৯৪৫-৪৬	১৯৪৬-৪৭ (সংশোধিত হিসাব)	১৯৪৭-৪৮ (বাজেট হিসাব)
১। রাজস্বআদায়—	৩৯৩৯	৪৫৫৬	৩৮৭৩	৪৭৬৭
২। রাজস্বব্যয়	৪৪১২	৪০৬০	৫২০১	৫৩৮৮
৩। উদ্বৃত্ত (+) ঘাট্তি (−)	−৪৭২	+৪৯৫	−১৩২৮	−৬২০

ভারত গভর্ণমেণ্ট বা বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট এই টাকার দ্বারা বাঙ্গলার কৃষি ও পূর্তকার্যের উন্নতি করিলে বাঙ্গালীর বাঁচার পথ কিছু প্রশস্ত হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে কতাদের শোষণ পথ যে অপ্রশস্ত হইয়া পড়ে। বাঙ্গালী কৃষক, কে রাম কে রাবণ তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পার। বাংলার মুস্লীমলীগ গভর্ণমেণ্ট প্রায় ত্রিশটী ইউরোপীয়ান ভোট হাতে রাখিয়া মসনদ দখল রাখিবার জন্যও বিদেশী মিলওয়ালাদের স্বার্থে বাংলার কৃষক এবং বাংলারও করিয়াছেন সর্বনাশ। বাংলার মুসলমান

ইহা কবে হৃদয়ঙ্গম করিবে? বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে পূর্বপাকিস্তানের বাংলাকে যে ভাবে শোষণ করা হইতেছে তাহার পরিণাম যে কত ভয়াবহ তাহা পূর্ববংগবাসী হিন্দুমুসলমানকে বোকার মতো ঠেকিয়াই শিখিতে হইবে। বাংলার আর্থিক অবস্থা বহুদিন ধরিয়া যেরূপ দ্রুত ঘাটতির বা অবনতির মুখে যাইতেছে তাহাতে এই পাটের টাকা সম্পূর্ণও তাহাকে দিলে হইবে না। শিল্পাদির দ্বারা তাহার অর্থাগমের পথ আরও প্রশস্ততর করিতে হইবে। বাংলার আর্থিক অবস্থা গত দশ বৎসরের হিসাব দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বাংলার আর্থিক অবস্থা (লক্ষ টাকা হিসাবে)

	১৯৩৭ -৩৮,	১৯৩৮ -৩৯,	১৯৩৯ -৪০,	১৯৪০ -৪১,	১৯৪১ -৪২,	১৯৪২ -৪৩,	১৯৪৩ -৪৪,
১। রাজস্ব আদায়—	১৩০০	১২৭৭	১৪৩২	১৩৫৫	১৪৯৪	১৬৪৬	২৩৭২
২। রাজস্ব ব্যয়—	১১৮৩	১২৭৭	১৩৭১	১৪৪৫	১৫৫০	১৬৭৯	২৬৭৫
৩। উদ্বৃত্ত (+) ঘাটতি (−)	+১১৭	×	+৬১	−৯০	−৫৬	−৩৩	−৩০৩

মূর্খ চাষা পাটের চাহিদা জোগান (demand and supply) বোঝে না, তাহাকে ইহা বুঝাইবার কেহ চেষ্টাও করে না এবং কেহ এসব কথা যদি তাহাদিগকে বুঝাইতে চায়, তবে সে সরকারের কুদৃষ্টিতে পড়ে। চাষীরা যদি পাট কম জন্মায় তবে তাহারা পাটের দাম বেশী পাইবে। পাট না পাইলে অন্য দেশের চলে না। বাঙ্গালী চাষী সমবায়ে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিলে, তাহারা কম পাট জন্মাইয়াও বেশী মূল্য পাইতে পারে। বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে কয়েক বৎসরের 'চাহিদা যোগান' (demand and supply) এর হিসাব দেখিলেই এ তথ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিশ্বযুদ্ধের পরে এ চাহিদা যে অত্যধিক বাড়িয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

গড়ে বৎসরে	কাটতি (Consumption)	উৎপন্ন (outturn)	মূল্য গড়ে মণ প্রতি
যুদ্ধের পূর্বে	৪২০ লক্ষ মণ	—	১২॥৵০
১৯২৪-২৫	৪২৫ „ „	৪৬০ লক্ষ মণ	১৪।⁄০
১৯২৫-২৬	৪৬৫ „ „	৪৩০ „ „	২০৲
১৯২৭-২৭	৫০০ „ „	৬১০ „ „	১৬৸⁄০
১৯২৭-২৮	৫০০ „ „	৫১০ „ „	১২৲
(আনুমাণিক)		(Final fore cast)	

১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানে ১৮,৭৭,০০০, একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। পূর্ববৎসর ২০,৫০,০০০ একর জমিতে পাট চাষ হয় পাকিস্তানে। এ বৎসরের আনুমাণিক পাটের উৎপাদন ৫৪,৭৯,০০০ লক্ষ বেল। মূল্য গড়ে মণ প্রতি পাকা ওজনের ৩০৲।৩১৲ টাকা

উপরে যে মূল্য তালিকা দেওয়া হইল তাহা উর্ধতন আড়তদার বা পাট ব্যবসায়ীদিগের দর। 'ফ'ড়ে' বা ক্ষুদ্র খরিদ্দারদের লভ্যাংশ বাদ দিলে চাষীরা মণ প্রতি ইহার অর্ধেকও পায় না। ভারতের পাটের কলগুলিতে বৎসরে প্রায় ২৮০ লক্ষ মণ পাট কাট্‌তি হয়। ১৯২৮ এর ১লা জুলাইতে ভারতের পাট কলে প্রায় ১৭৫ লক্ষ মণ পাট উদ্বৃত্ত থাকে এবং সব কলে মোটের উপর ২৪৫ লক্ষ মণ পাট উদ্বৃত্ত থাকে। বাৎসরিক পাটের কাট্‌তি গড়ে ৪৫০ লক্ষ মণ ধরিলেও বাঙ্গলার চাষীর ২০০ মণের বেশী পাট জন্মান উচিত নহে। আর যদি ইহার অর্ধাংশ জন্মায় তবে ওই অর্ধেক ফসলেই যে দ্বিগুণ মূল্য লাভ করিবে। বাঙ্গলা প্রকৃত স্বাধীন হইলে এই পাটের আবাদ নিয়মিত এবং সুব্যবস্থিত করিয়া বাঙ্গলার চাষী বর্তমানের তিন চারি গুণ বেশী লাভ করিতে পারিত। বিদেশী সরকার তাঁহার জাত ভাইদের খাতিরে ইহা করেন নাই। আমাদের দেশের স্বরাজ ওয়ালারা পূর্ববঙ্গীয়

পাকিস্তান ওয়ালারা এই একটা বিষয়েও প্রাণের ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং তীব্র কর্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাতে সফলতা লাভ করিলে তাঁহারা বাঙ্গলার 'জনগণ মন অধিনায়ক' সত্য সত্যই হইতে পারিতেন এবং তাঁহাদিগের পশ্চাতে এই দুর্জয় অমোঘ প্রজাশক্তি তাঁহাদিগকে যথার্থ স্বরাজ লাভে এবং তাহার রক্ষায় প্রভূত বল দান করিত। যে নৈষ্টিক সাধনা চরকার চক্র কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া মহাত্মা গান্ধীজীর ভিতর জাগ্রত, প্রস্ফুট হইয়াছে সেইরূপ একটি নৈষ্ঠিক একাগ্র সাধনা পাটকেন্দ্র অবলম্বন করিয়া কাহার ভিতর জাগ্রত, দীপ্ত, ভাস্বর হইয়া উঠিবে? তিনটি ইউরোপীয় সদস্যদের ভোট সমর্থন লোলুপ না হইয়া মুস্লিলিম লীগ গভর্ণমেণ্ট বাংলায় হিন্দুদিগের সহিত সহযোগিতা করিত যদি; তবে একবৎসরেই পাটচাষীদের অর্থাগম খুবই প্রচুর করিতে পারিত।

ইহার পরে দুইটী বিশ্বযুদ্ধের ফলে পাটের কাটতি বাড়িয়াছে অনেক, কিন্তু উৎপাদন নানা কারণে অপেক্ষাকৃতভাবে কমিয়াছে। ইহাতে বর্তমানে পাটের দর গড়পড়তায় মণ প্রতি ২০।২১৲ হইলেও পাটচাষী প্রকৃত লাভবান্ হইতে পারিতেছে না। মণ প্রতি ৩।৪৲ ট্যাক্স দিতে বাধ্য হওয়ায় যাহারা পাট ক্রয় করিতেছে তাহারা ৩।৪৲, টাকার স্থলে ৮।৯৲ টাকা কম দামে লইতেছে। আর ফাটকা বাজার, কালা বাজারের দুর্নীতির ফলে এবং উপরের কর্ম্মচারীদের ঘুষ খাওয়ার ফলে পাটচাষীর দুর্দশা ক্রমেই বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। জনসাধারণের গভর্ণমেণ্ট যদি সত্যই জন সাধারণের হইত তবে জনসাধারণকে শোষিত ও লুন্টিত করিয়া মুষ্টিমেয় সরকারী পরিচালক ও সরকারী কর্মচারীদের অত্যধিক পেট ভরিবার ব্যবস্থা হইত না, গরীব পাটচাষীদের উপবাসী রাখিয়া! ইংরাজ শাসন ও শোষণের ব্যক্তিগণের (Personnel) মাত্র পরির্বর্তন হইয়াছে পাকিস্তানী রাষ্ট্রে এবং ভারত রাষ্ট্রেও, ইংরাজ আমলের ঘুষ ও কদাচার ভরা শাসন ও শোষণ নীতির মূল প্রণালীর বিশেষ পরিবর্তন আজিও হয় নাই। কাজেই পাটচাষে

বাংলার কৃষক সেরূপ ধনী হইতে পারিতেছে না। পাটের কণ্ট্রোল তুলিয়া দিলে এবং পাটের বড় বড় মহাজন ও পাটের মিলগুলিকে সত্য সত্য 'কণ্ট্রোল' করিলে পাটচাষী প্রকৃতপক্ষে প্রচুর অর্থ লাভ করিতে পারিত। কিন্তু "উল্টা বুঝিলু রাম।" সরকারী কণ্ট্রোলের আওতায় পড়িল যত সব চুণোপুঁটী পল্লীর কৃষক ও ক্ষুদে ফড়েরা। বড় বড় আড়তদার, মুনাফাখোর পাটের মহাজনরা সরকারী পকেট নানাভাবে ভর্তি করিয়া সে 'কণ্ট্রোলে'কে যে, 'কলা' বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছেন তাহা নির্জলা সত্য। যে সরিষা দ্বারা ভূত তাড়াইতে হইবে, যদি সেই সরিষাকেই ভূতে পায় তবে ভূত তাড়ান হইবে কি করিয়া? যাঁহারা প্রজার ঘরে অর্থ আনিয়া দিবেন, সেই সব সরকারী কর্মচারীরাই যদি চোর চোট্টার দল হন, জুয়াচুরি, মিথ্যা প্রবঞ্চনার নটগুরু হন, তবে প্রজার বা পল্লীর মঙ্গল হইবে কি করিয়া? ইংরাজ শাসনের অভিশাপে পল্লীকে শুষিয়া, ভাতে মারিয়া. জলে শুকাইয়া সহরকে করা হইয়াছিল অর্থসম্পদশালী বড়লোকের আড্ডা, দুষ্ট রাষ্ট্রনীতি চক্রের গোপন ঘাঁটি; আর দেশী শাসনে যদি সে সব ঠাঁট, আড্ডা আর ঘাঁটি বজায়ই থাকিল, তবে তাহা যে স্বাধীনতা নয়, স্বরাজ নয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়, তাহাও মুখ ফুটিয়া বলিবার উপায় নাই, কারণ ওই 'কণ্ট্রোল' বা 'অকণ্ট্রোল' ওয়ালারাই যে জিভ্ বা বাগেন্দ্রিয়কে এবং হাত বা কর্মেন্দ্রিয়কে 'কণ্ট্রোল' করেন পদে পদে। আইনের সব চেয়ে বেআইনী নিয়ম এই যে আইন কর্তাদের মুষ্টিমেয় লোক তাঁহাদের দলীয় উপদলীয় স্বার্থে জনসাধারণের আইন ও ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ ও অধিকার অন্যায় ও বেআইনীভাবে করেন পদদলিত। যে আইন করে সে আইন ঠিক ভাবে ঠিক ভাবে প্রয়োগ হইতেছে কিনা তাহার বিচার ভার দিবে অদলীয় নিরপেক্ষ ন্যায়পরায়ণ চরিত্রবান্ বিচারকের উপর। চোর যদি চোরের উপর বিচারের ভার দেয়, তবে সে চোর বেচারা

চোরের উপরও বাট্‌পাড়ী করে—ইহা সে চোর যে না বুঝে তাহা নহে, কিন্তু তাহার দলীয় স্বার্থ ও অর্থলোভ চোরে চোরে মাসতুতু পিসতুতু ভাই সম্বন্ধ রাখে। বাংলার পাটের ব্যাপারে যে চোরা কারবার আর দুর্নীতি চলিতেছে তাহা রোধ করিবার ক্ষমতা বর্তমান রাষ্ট্রকর্তাদের নাই কারণ অর্থনৈতিক কারণে ইহাদেরই কাছে যে রাষ্ট্রকর্তাদের হাত পাতিতে হয়। কাজেই পাটের ন্যায্যমূল্য পাটচাষীরা যদি সত্য সত্যই পাইত, তবে পল্লীর রূপশ্রী অন্যরূপ হইত। পূর্ববাংলা করে পাটের চাষ আর পশ্চিম বাংলার মিল সব করে এর ব্যবহার। এক প্রদেশ উৎপাদন করে আর এক প্রদেশ পণ্য দ্রব্য কাট্‌তি করে; সে দুই দেশে যদি রাষ্ট্রীয় মহিষে মহিষে লড়াই বাধে তবে নলখাগড়া পাট চাষীরাই মরে বেশী গরীব ব্যাপারীদের সঙ্গে সঙ্গে। এই মহিষের লড়াইকেও বলিতে হইবে রাষ্ট্রের প্রজা কল্যাণনীতি। পৃথিবীর সর্বত্রই রাষ্ট্রনীতির ভণ্ডামি আর কপটতা এই স্থানে যে, যাহারা কার্যে, আচরণে প্রজাদের করিতেছে সর্বাপেক্ষা নির্যাতিত, শোষিত তাহারাই বাক্যে, প্রচারে, বচন বিন্যাসে সাজে প্রজা দরদী, প্রজার অন্তরঙ্গ বন্ধু। বাংলার পাট লইয়া কতো যে ভণ্ডামি, কপটতা, জাল, জুয়াচুরি, রাষ্ট্রনৈতিক ফাটকা বাজার চালান হয় তাহার ইতিহাস কয়জন লোক বুঝে? মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রীয় ধনিকের ও ব্যক্তিক ধনিকের স্বার্থে ও কারসাজিতে পাটের ব্যবসা বর্তমানে যে ভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহাতে পাটচাষীদের বিশাল গণসমষ্টির কেবল স্বার্থ ও আর্থিক অধিকারই পদদলিত হইতেছে না, তাহাদের উৎপাদন শক্তিও নানাভাবে ব্যাহত হইতেছে।

এক শ্রেণী বা এক সম্প্রদায় বা দুই চারিটী শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের পাপে একটী সমগ্রদেশ পরপদানত, লুণ্ঠিত, শোষিত, বিধ্বস্ত হইতে পারে না। শ্রমিকেরা ধনিকের ঘাড়ে দোষ চাপান, ধনিকেরা শ্রমিকের মাথায় অপরাধ চাপান। জমিদার, মনিব বা মহাজন,

প্রজা, ভৃত্য, খাতকের পাপ কাহিনী বর্ণন করেন; আর প্রজা ভৃত্য বা খাতক জমিদার, মনিব বা মহাজনের অত্যাচার দেশের সর্বনাশ করিল বলেন। প্রকৃত কথা পাপ, অধর্ম, অন্যায়, অত্যাচার দুই পক্ষেই আছে। প্রকৃত জাতীয় কল্যাণে উভয় পক্ষকেই আত্মশোধন করিতে হইবে। ধনিক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যদি আত্ম সংশোধন না করিয়া কেবল শ্রমিক ও কৃষকদিগের উপর দোষ চাপান, তবে জাতীয় সমস্যা আরও জটিল ও কুটিল হইয়া দাঁড়াইবে এবং পরস্পরের উন্নতি ও কল্যাণ আরও সুদূর পরাহত হইবে। এই ধনিক এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হইতেই যদি নায়ক ও নেতাগণ অগ্রে আপনা দিগের সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গেই, অপর পক্ষের সংশোধনে হস্তক্ষেপ করেন, তবেই স্থায়ী কল্যাণ প্রসূত হইবে। শ্রমিক, কৃষক, প্রজারা মূর্খ, কিন্তু তাঁহারা ত শিক্ষার বড়াই করিয়া থাকেন। এই শিক্ষা, এই বিদ্যা যদি তাঁহারা জন সাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত না করিয়া কেবল গোলামিতেই নিয়োজিত করেন, তবে তাঁহাদিগকে উন্নত স্থান হইতে অবনত স্থানে ফেলিয়াই এই অবনত সম্প্রদায় জয়যাত্রা করিবে। এই শূদ্রযুগে শূদ্রের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। শূদ্রকে তাহার অধিকার দিতে হইবে। গুণ এবং কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, চরিত্র এবং ধর্মের উচ্চ আসন যদি শূদ্রেরা স্ব মহিমায় দখল করিতে পারে, তবে, হে উচ্চবর্ণ, তুমি কেবল বাপ ঠাকুরদাদার দোহাই দিয়া এবং কেবল সূতার চাপরাশের বলে সে জয় যাত্রা, সে তীব্রগতি রোধ করিতে পারিবে না। এই সকল উন্নত সম্প্রদায়েরও আত্মসংশোধনের সময় উপস্থিত। শিক্ষিত, ভদ্র, বাবু, জমিদার, মহাজন প্রভৃতিরও এই পল্লী উদ্ধারণ ব্রতে ব্রতী হইতে হইবে, নিজেকে শুদ্ধ, শান্ত, পবিত্র, সংযত করিয়া। তোমাদের দ্বারা গ্রামের কি উন্নতি হইতেছে বল দেখি? গ্রামের জমিদার বাবুরা, ধনী মহাজন বাবুরা গ্রামে থাকেন না। তাঁহারা প্রজার অভাব অভিযোগের দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখেন না। প্রজা

বা খাতকের নামে নালিশ করিয়া তাহার সর্বস্বান্ত করিয়া তাহাদিগের টাকার দ্বারা তাঁহারা সহরে বসিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেছেন। ভদ্র চাকুরে বাবুরাও পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিতে বসিয়াছেন। গ্রামের যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা চাকরী ব্যপদেশে প্রায়শঃই বিদেশবাসী হইতেছেন। যাঁহারা ধনী, যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা যদি গ্রামে বাস না করেন তবে গ্রামের উন্নতি কি উপায়ে হইবে?

বর্ত্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ব বংলায় যাঁহারা সাম্প্রদায়িক ভীতাতঙ্কগ্রস্ত হইয়া, মুস্লীমলীগের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অন্যায় অত্যাচার ও নির্য্যাতন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য পল্লীর কৃষক, শ্রমিক, অর্থহীন জনসাধারণকে ত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানের সহরাদির দিকে চম্পট দিয়াছেন সেই ধনিকরা দেশের, পাকিস্তান পূর্ববঙ্গের কতো অনিষ্ট ও ক্ষতি করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার হিসাব নিকাশ কে করিবে? উপদল মুস্লীমলীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পাইয়া যে অত্যাচার নির্য্যাতন করিতেছেন তাহা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে, পল্লীর জনগণকে, সাধারণকে লইয়া যে গণসংগ্রাম গণপ্রতিরোধ শক্তি জাগ্রত করিয়া ঐ সব অন্যায় অত্যাচার নির্য্যাতনের প্রতিকার করা, তাহার কষ্ট ও ত্যাগসাধ্য পথ পরিত্যাগ করিয়া "যঃ পলায়তি স জীবতি" যে পলায় সেই বাঁচিয়া থাকে—এই স্বার্থপর, ক্ষুদ্র, হীননীতি তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যদি স্ব স্ব স্থানে পল্লীতে পল্লীতে শক্ত হইয়া বসিয়া থাকিয়া অন্যায়, অত্যাচারাদির প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেন, তবে পল্লীতে এতো অন্যায়, অত্যাচার হইতে পারিত না। মুস্লীমলীগ নেতারা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে গুণ ও চরিত্র, কর্মদক্ষতা ও প্রজা হিতৈষণার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র মুস্লিমলীগপন্থী মুসলমান হইলেই চাকরীতে, সরকারী কর্মসমূহে নিয়োগ করার ফলে প্রধানত ইংরাজ আমলে চাকরীজীবী তথাকথিত উচ্চবর্ণের "বর্ণহিন্দুগণ" চাকরীর পথ রুদ্ধ

দেখিয়া এবং অর্থ উপার্জনের অন্যান্য পথও সাম্প্রদায়িক মুসলমানী স্বার্থপরতায় এবং অত্যাচার অবিচারে রুদ্ধ দেখিয়া গ্রাম বা পূর্ব বাংলা পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা যে ভ্রান্ত অনিষ্টকর নীতি তাহা তাঁহারা এখন কতকটা বুঝিতেছেন। পলাইয়া জীবন ধারণ যে করিবার চেষ্টা করে, তাহার জীবন ধারণ বিড়ম্বিত হইবে সর্বক্ষেত্রেই ; কারণ সে সংগ্রামে হইয়াছে ভীরু, কাপুরুষ, অযোগ্য। এই দুর্বলতা, লইয়া সে কোথায়ও জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিবে না। পরাজিতের মনোভাব তাহাকে জীবন সংগ্রামের সর্বক্ষেত্রেই অপটু ও ব্যর্থ করিবে। চাকরীর মোহ কাটাইয়া পল্লীর উচ্চ শিক্ষিতেরা যদি নব নব গবেষণায় কৃষি, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্যাদির নানা বিধ স্তরে তাঁহাদের বুদ্ধি ও শক্তি নিয়োগ করিতে পারেন তবে তাঁহাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীবাসী জনসাধারণেরও অভ্যুদয় হইবে। নানাবিধ কুটীরশিল্প, রসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত, নিত্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারখানাদি করিয়া তাঁহারা পল্লীতে পল্লীতে নানাভাবে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সঙ্ঘশক্তি ও সংগঠন শক্তি উদ্বোধিত করিয়া উপদলীয় রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের প্রতীকারও করিবার পথ প্রশস্ত করিতে পারেন। কিছু পূর্বে গত ছয় মাস ধরিয়া দৈনিক প্রায় দুই হাজার করিয়া প্রায় ষাট লক্ষ মুসলমানও পাকস্তান রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থান ভারত রাষ্ট্রে বসবাসের জন্যও গিয়াছিল। ইহাতে মুসলমান জনগণেরও মুস্লিমলীগ পরিচালিত পাকিস্থানের রাষ্ট্রশাসনে আস্থা ও বিশ্বাস নাই ইহা প্রমাণিত হইলেও, তাঁহাদেরও পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানে যাওয়া ভ্রান্ত নীতি। তাহার পরিবর্তে সেই সব নির্য্যাতিত ও দুঃখনিপীড়িত মুসলমানগণ যদি হিন্দুগণের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পাকিস্থানের কুশাসন প্রণালীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া গণপ্রতিরোধ আরম্ভ করেন, তাহা হইলে মুস্লীম-

লীগ ইহাতে হিন্দুর ষড়যন্ত্র, দুরভিসন্ধি বলিতে পারিবে না। বাংলায় এই হিন্দু-মুসলমান মিলিত গণপ্রতিরোধের ভিতর দিয়া যে জাতীয় সংহতিশক্তি বৃদ্ধি পাইবে তাহা অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শীলনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই তাহাদিগকে জয়যুক্ত করিবে। তাহাতেই গড়িয়া উঠিবে যথার্থ গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, চরিত্র নৈতিক স্বাধীনতা, স্বরাজ।

যশোহরের ও খুলনার কালিয়া এবং সেনহাটী গ্রামে অনেক পরিবারে এখনও এরূপ নিয়ম আছে যে চাকুরীয়া বাবুরা পরিবার সঙ্গে লইয়া চাকরীস্থলে যাইতে পারেন না। তাহার ফলে উক্ত গ্রামদ্বয় অনেক বিষয়ে অগ্রসর এবং বর্ধিষ্ণু। পাড়াগাঁয়ে যদি বাবুদের পরিবারেরা থাকেন, তবে বাবুদের ও তথায় মধ্যে মধ্যে পদার্পণ হইবে। গ্রামের জিনিষ পত্রাদির ক্রয় করার ফলে গ্রামে তাঁহাদের অর্থগুলি চলাফেরা করিবে। হাট বাজার গুলি ভালরূপে চলিবে। রাস্তাঘাটগুলি ভাল হইবে। জঙ্গল কাটা পড়িবে। পুষ্করিণী গুলির পঙ্কোদ্ধার করিয়া তাহার জল সুপেয় করা হইবে। নিজেদের ছেলেমেয়ের পড়ানোর জন্য স্কুলগুলির অবস্থাও উন্নত করিতে হইবে। নিজেদের ছেলেমেয়ের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারখানা হাঁসপাতাল গুলিও উন্নত হইবে। হে পল্লীমঙ্গলকামী ব্যক্তিগণ, আপনারা পল্লীর বাবুদের পরিবারবর্গকে যদি গ্রামে রাখার ব্যবস্থা করিতে পারেন তবে পল্লীমঙ্গল সমস্যা অনেকটা এখানেই পূরণ হইবে। গ্রামের ধনী লোকেরা পূর্বে দেল, দোল, দুর্গোৎসব, পূজা, পার্বন, সিন্নি, রোজা, ইদ্ উপলক্ষে অনেক ব্যক্তিকে অন্নদান করিতেন! মন্দির মসজিদাদি নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খননাদি পূর্ত কর্ম্ম পুণ্যজনক মনে করিতেন। এই সব ব্যষ্টির কার্যে সমষ্টির কল্যাণ সাধিত হইত। ইষ্ট ও পূর্ত কার্যের দ্বারা লোক কল্যাণ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা স্বর্গলাভ করিতেন। হিন্দুর অত্রি সংহিতা বলিতেছেন যে—"অগ্নিহোত্রং তপঃ

সত্যং বেদানাঞ্চৈব পালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবশ্চ ইষ্টমীত্যভিধীয়তে॥ ৪৩। বাপীকূপ তড়াগাদি দেবতায়তনানিচ। অন্নপ্রদানমারামাঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥ ৪৪। ইষ্টং পূর্ত্তং প্রকর্তব্যং ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ। ইষ্টেন লভতে স্বর্গং পূর্ত্তেন মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥ ৪৫। ইষ্টাপূর্ত্তৌ দ্বিজাতীনাং সামান্যৌ ধর্মসাধনৌ। অধিকারী ভবে চ্ছূদ্রঃ···৪৬।

"অগ্নি হোত্র, তপস্যা, সত্যপরতা, বেদাজ্ঞা প্রতিপালন, অতিথি সৎকার ও বৈশ্যদেব—ইহাদের নাম ইষ্ট। বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয় উৎসর্গ, দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা, অন্নদান, আরাম (উপবন) উৎসর্গের নাম পূর্ত। ইষ্টদ্বারা স্বর্গ ও পূর্ত দ্বারা মোক্ষলাভ হইবে। ব্রাহ্মণ যত্ন পূর্বক ইষ্ট ও পূর্ত করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যেরও ইহাতে তুল্য অধিকার। শূদ্র পূর্তকার্যে অধিকারী বটে।" এই পূর্তকার্যে চারি বর্ণেরই অধিকার আছে এবং ইহা স্বর্গাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে, কারণ ইহা মোক্ষপ্রদ অর্থাৎ মোক্ষসদৃশ কল্যাণ দায়ক। গ্রামের বাবুরা, বড় লোকেরা, জমিদার, মহাজন ধনিকেরা এই সব ইষ্টাপূর্ত করিয়াই গ্রামবাসী সকলের প্রীতিধনে আরও ধনী হইতে পারেন। অনেকে বলিবেন এখন লোকের সেরূপ অর্থ নাই। কথাটা কতক সত্য বটে। অন্যদিকে তো ইঁহাদিগের ব্যয়বাহুল্য খুবই আছে। ভিতরে 'ছুঁচোর কীর্ত্তন' কিন্তু বাইরে তো 'কোচার পত্তন' বেশ আছে। গৃহিণীর লোহা, শাঁখা, রূপার খাড়ু, বাউটীর স্থানে এখন সোনার চুরী, তাগা, নেকলেস্ (গলার—দড়ি?) ইত্যাদি দেখা যায়। পূর্বকালের ধুতি চাদর এবং বড় জোর একজোড়া চটী জুতার স্থানে এখন বিলাতী মিহি সূতার কাপড়, গেঞ্জী, শার্ট, কোট, কোটের উপর কোট (ওভার কোট), জুতা, ছাতা, ঘড়ি, চেন, আংটী আদি কত অঙ্গ ভূষণ বিরাজমান হইতেছেন। বিলাস ব্যসনে জাতির অস্থি মজ্জা জর্জরিত হইতেছে। বিলাস ব্যসনে দরিদ্র গ্রামবাসীও আজকাল যে

অর্থ অপব্যয় করিতেছে, তাহার দ্বারাও গ্রামে ভালো আলো, বাতাস রাস্তা, ঘাট, ও জলের ব্যবস্থা করা যায়; আর বাবুদের অপব্যয়িত অর্থেতো কথাই নাই। ইতর ভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র গ্রামের সকলেই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পল্লী উদ্ধারণ যজ্ঞে ব্রতী হইলে পরস্পরে প্রীতির বন্ধন, প্রেমের ডোর, সহানুভূতি, সহধর্মিতা বাড়িয়া যাইবে। পল্লীর, রাস্তা, ঘাট, আলো, বাতাস, জল শোধন লইয়াই সকলে সমবেত ভাবে আসরে নামিতে পারেন। ভাল আলো, বাতাস ও জলের অভাবেই পল্লীর এই দারুণ দুরবস্থা। পল্লীর এই গগন পবন জীবন শোধন সর্ব্ব ধর্মাবলম্বীই একযোগে করিতে পারেন; এখানে হিন্দু-মুসলমান পৃথক নাই। পল্লীর শ্রমিক কৃষকের শ্রম ও শক্তি এবং ধনিক জমিদারের সাহায্য ও বুদ্ধি একযোগে সফলতায় লাগানোর প্রশস্ত ক্ষেত্রই এই পল্লী মাটী 'মা—টী'।

বঙ্গবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের অন্নসমস্যা ও অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যা মারাত্মক ভাবে প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ববঙ্গ প্রধানত কৃষি প্রধান দেশ, আর পশ্চিম বঙ্গ শিল্প প্রধান দেশ। পূর্ব বঙ্গের প্রধান ফসল ধান ও পাট। পাটের বিনিময়ে পাকিস্থান পূর্ববঙ্গ স্বচ্ছন্দে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত রাষ্ট্র হইতে কয়লা, তৈল বস্ত্রাদি অনেক কিছুই আনিতে পারেন। কিন্তু আপোষ, শান্তির মিলনেচ্ছায় তাহা হইবে না। অনেক গুঁতাগুঁতির পর ১৯৪৯ জুন পর্য্যন্ত রপ্তানী লাইসেন্স ব্যতিরেকে ভারত সরকার ও পাকিস্থান সরকার যথাক্রমে পরস্পরে ৫০ লক্ষ বেল কাঁচা পাট এবং ৫০ হাজার টন পাটজাত দ্রব্য আমদানী রপ্তানী করিতে স্বীকার করিয়াছেন। সম্প্রতি দুই রাষ্ট্রে স্বীকৃত হইয়াছে যে পাকিস্তান ভারতরাষ্ট্রে পঞ্চাশ লক্ষ বেল পাট এবং অর্ধলক্ষ বেল তুলা দিবেন সাময়িক বন্দোবস্তে এবং তাহার বিনিময়ে পাকিস্তান ভারত রাষ্ট্র হইতে লোহা ইস্পাত এবং কয়লা পাইবেন। এই আপোষের ফল ভাল

হইবে আশা করা যায়। এই বুদ্ধি গোড়াতেই হইলে এত গণ্ডগোল ও ক্ষতি হইত না। আশা করা যায় দুই রাষ্ট্রই ইহা আইনত এবং কার্যত অনুমোদন করিবেন। পাকিস্তানের সরকারী প্রতিনিধিরা ৩১শে জানুয়ারী (১৯৪৯) পর্যন্ত ভারতে ৩,৬০,০০০ বেল তূলা রপ্তানী করিতে স্বীকার করিয়াছেন। ভারত রাষ্ট্র ইহার পরিবর্তে কয়লা দিতে চাহিয়াছেন। সম্প্রতি বোম্বাই, ৯ই নভেম্বর, ১৯৪৮, ভারত ও পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট কর্মচারীদের বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, পাকিস্তান ভারতকে ৬৫ বেল তূলা দিবে এবং ভারত ইহার পরিবর্তে তিন লক্ষ বেল বস্ত্র এবং একলক্ষ বেল সূতা দিবে। সমগ্র পাকিস্থানে এবার দেড় লক্ষ টন বা চল্লিশ লক্ষাধিক মণ খাদ্যশস্যের ঘাটতি হইবে। পাকিস্থান সরকার এই অন্ন সমস্যার মূল সন্ধান না করিয়া কেবল মাত্র উপরসা উপরসা দাওয়াই বাতলাইতেছেন। তাঁহারা আইন জারী করিয়াছেন যে ত্রিশ বিঘার জমির উপর যাহার ধানের জমি আছে তাহাদের পরিবারের প্রত্যেকের মাথা প্রতি বৎসরে সাড়ে সাত মণ ধান বাদে আর সমস্ত ধান সরকারী গুদামে 'কণ্ট্রোল' দামে বিক্রয় করিতে হইবে। বাংলার কৃষকেরা ও শ্রমিকেরা দৈনিক অন্তত পক্ষে দুইসের চাউল না খাইয়া পারে না। তাহাতে তাহাদের মাথা প্রতি, প্রতি মাসেই দেড় মণ চাউল ও বৎসরে আঠার মণ চাউলই লাগে। বৎসরে সাড়ে সাতমণ ধানে বা পাঁচ মণ চাউলে প্রায় সিকি ভোজন হইবে। এই সিকি ভোজনে পাকিস্থানী মুসলমানগণও যে পাকিস্থানী সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিবে—এ জ্ঞান বা দূরদৃষ্টি কর্তাপক্ষের নাই। তাঁহারা কাশ্মীর ও হায়দরাবাদে শতাধিক কোটী টাকা মানুষ মারণে বৃথা অপব্যয় করিবেন; ঘুষে ঘুষে প্রায় সকল কর্তারাই পেট ভরিবেন; আর বাঙ্গালী পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু মুসলমান সকলের পেটের গ্রাস ধরিয়া টান দিবেন: ইহা শাসন নহে শোষণ। হিন্দুদের

কিছু ধান ও টাকা ছিল। টাকা তাহারা সব হিন্দুস্থানে লইয়াছে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান সরকারকে তাহারা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। তাহার পরে অন্তত পনর লক্ষ (ততোধিক না হইলেও) পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গ ভারত ও ভারত রাষ্ট্রে আসিয়াছেন এবং আরও আসিতেছেন। তাহার ফলে পূর্ববাঙ্গলার কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্যাদি বহু ক্ষতিগ্রস্থ হইল। তাহার বিষময় ফল রাষ্ট্রের উপরও পড়িতেছে এবং আরও পড়িবে। একদিকে মুস্লীমলীগ দল ভুক্ত গুণ্ডাদের জঘন্য অত্যাচার এবং পাকিস্তান সরকারের অবিচার বা বিচার বিভ্রাট পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে, অন্যদিকে পাকিস্থান সরকারের গঠনমূলক, ধনসংস্থানকর আয়োজনের অভাব হিন্দুদলনে পর্যবসিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ ভৌগোলিক, ভাষাতাত্বিক, অর্থনৈতিক, ব্যবসাবাণিজ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক সংহতি ও একাগ্রতার পরিবেশে এতদিন সুগঠিত হইয়া, আজ দুই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতাবলম্বী, বিরুদ্ধ দর্শনাবলম্বী, বিরুদ্ধ অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি আদি দুই বিরুদ্ধ রাষ্ট্র হইয়া দুই শত্রু রাষ্ট্রে পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছে। ফলে অন্নসমস্যা উভয় বঙ্গেই কঠিনতম সমস্যায় পরিণত হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ধান চাউলের দাম প্রায় অর্ধেক। তথাপি পশ্চিম বঙ্গে প্রয়োজনের তুলনায় ধান ছয় লক্ষ টন ঘাটতি এবং গম পঁচাত্তর হাজার টন ঘাটতি। পশ্চিম বঙ্গে ডাইলের উৎপাদন প্রায় শূন্য। মাছ মাংস একেবারেই অপর্যাপ্ত, প্রয়োজনের এক তৃতীয়াংশ সরিষাদির তৈল সে পায়; ইহার নিজের কোনো চিনির কল নাই, কাজেই চিনির জন্য পরমুখাপেক্ষী। তাহার উপর পশ্চিমবঙ্গ বাসীরা সাধারণত শ্রমবিমুখ। তাহাদের স্থান অবাঙ্গালীরা দখল করিয়া লইতেছে। শ্রম শিল্পীদের পাঁচ ভাগের চারিভাগ অবাঙ্গালীরা দখল করিয়া লইতেছে। শ্রম শিল্পীদের পাঁচভাগের চারিভাগ অবাঙ্গালী।

ট্যাক্সি বাসাদি আবাঙ্গালী পাঞ্জাবী, শিখদের প্রায় এক চেটিয়া। চা বাগানের তিন লক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে পৌনে তিন লক্ষ অবাঙ্গালী। তাহার সেরূপ কোনো জলসেচন প্রণালী নাই উর্বর কৃষি ক্ষেত্রাদি ও বাণিজ্যিক নৌ জাহাজাদি চালাইতে। দামোদর জল বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কার্যে পরিণত হইলে তবে দশ বৎসরের পরে এই দুরাবস্থা ঘুচিতে পারে। তাহার উপর আসিল পশ্চিম বঙ্গের উপর পনর লক্ষ হইতে কুড়ি লক্ষ বাস্তহারা আশ্রয়প্রার্থীর অভিযান। পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিম বঙ্গে মানব শক্তির (man-power এর) যেরূপ অপচয় ও অপব্যবহার হইতেছে, তাহাতে উভয় দেশের সংকট শুধু অন্নসমস্যাতে বদ্ধ থাকিবে না। ইহার পশ্চাতে পশ্চাতে উভয় রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক, সমাজ নৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক দুর্যোগ ও সঙ্কট ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীর দুর্দশা আরও যে ভারত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্র উভয়েই বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীকে কুনজরে এবং অবহেলার চোখে দেখিতেছেন। উভয় বাংলার রাষ্ট্র নেতারা নেতৃত্বের অযোগ্যতার পরিচয় প্রতি পদে পদে দিতেছেন। পূর্ব বাংলা হইতে যদি এক কোটি বিশ লক্ষ হিন্দুর বাস্তহারা অভিযান পশ্চিম বঙ্গে ও ভারত রাষ্ট্রে আরম্ভ হয় তবে তাহার অর্থনৈতিক, খাদ্য, বস্ত্রনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং ধার্মিক সমস্যাদি পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান উভয় রাষ্ট্রের পক্ষেই পাঞ্জাব অপেক্ষা বহুগুণ কঠিনতর হইবে। আজ এই দুই বঙ্গের অন্নসমস্যাদির মূলে রহিয়াছে রাষ্ট্রীয় সমস্যা। রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানে যদি এই দুই রাষ্ট্র এক না হইতে পারে যৌথভাবে, তবে সমবায় প্রথায়, যৌথ প্রথায় কেন তাহারা অন্ন, বস্ত্র, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্যাদি সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিবে না? উভয় রাষ্ট্রের নেতারা যদি সঙ্কীর্ণচেতা, প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরায়ণ হন এবং প্রজা সমষ্টি, বিরাট প্রজা সমষ্টির যথার্থ কল্যাণে চরিত্র বিশুদ্ধ করিয়া অবহিত এবং কর্মে অনুপ্রাণিত না হন,

তবে তাঁহাদিগকে এক বিরাট বিপ্লবের সম্মুখীন হইতে হইবে, যে বিপ্লবকে তাঁহারা পশুবলে আদৌ দমন করিতে পারিবেন না। বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান যতদিন এই বিপ্লবের অগ্নিপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া তাহার শক্তি, অর্থ, সমাজ, রাষ্ট্রাদি সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করিতেছে ততদিন তাহাদের এই মারাত্মক দুঃখ, দৈন্য, দুর্দশা, নবশোষণ, নব দাসত্ব অনিবার্য, অপরিহার্য। যে বাঙ্গালী বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে সমগ্র ভারতকে জাগাইয়া তুলিল, স্বাধীনতা স্বপ্নের বাস্তব রূপ রাষ্ট্রক্ষেত্রে সম্ভব করিল, সেই বাংলার হিন্দু মুসলমান, বাঙ্গালী হিন্দুমুসলমান কি ব্যর্থ রাষ্ট্রসাধনায় পরস্পরের শত্রু হইয়া কেবল শক্তি ক্ষয় করিবে? তোমার পূর্ব ইতিহাস কি সাক্ষ্য দেয় বাঙ্গালী? সেই সাক্ষ্য ধরিয়া অগ্রসর হইবার আহ্বান ওই যে দিক্‌চক্রবালে! পশ্চিম বঙ্গ, যে পূর্ব্ববঙ্গ গণভোটে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করিয়া তোমার স্বাধীনতা, ভারতের সহিত রাষ্ট্রীয় মিলন সম্ভব করিল, সেই পূর্ব্ববঙ্গ যদি তোমার কোনো সহায়তা, অন্তরের সহানুভূতি ও সহযোগিতা না পায়, তবে তাহার প্রতিক্রিয়া তোমার উপরেও পড়িবে। আন্তর্জাতিক বা সর্ব্বজাতিক সংহতির যুগে বাংলায় বাংলায় এই সমস্যা, পাকিস্তানে ভারতে এই সমস্যা সমাধানে হিন্দুমুসলমান তোমরা উভয়ে সমবেতভাবে যদি প্রস্তুত না হও, তবে অন্তর্বিপ্লবের ওই ধূমরাশি যে দেখিতেছ তাহা লেলিহান আগুণে জ্বলিয়া উঠিতে বেশী দেরী লাগিবে না। আর তাহাতে ইন্ধন যোগাইতে আন্তর্জাতিক বা সর্বজাতিক স্বার্থসংঘাত ওই যে তোমার পশ্চাতে শাণিত অস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মূর্খ হিন্দু মুসলমান বুঝিবে কি? তোমার অন্নসমস্যার মূল রাষ্ট্রসমস্যা, চরিত্র-সমস্যা, যথার্থ ধর্মসমস্যা। যে ধর্মমতবাদ এতো অনিষ্টের আকর, দুঃখ দৈন্যের সাগর, তাহা ধর্ম নহে, তাহা পরম অধর্ম। সেই অগ্নিপরীক্ষার দিন বা আমাদের মন, মুখ, চোখ পরীক্ষার দিন, ওই যে নিঃশব্দ

পদসঞ্চারে নিগূঢ় ও নির্মম পদবিক্ষেপে তোমাদের দিকেও অগ্রসর হইতেছে।

৩। অন্নবস্ত্রাদি সমস্যার প্রধান কারণ ও তাহার প্রতিকার সংক্ষেপে।

পল্লীবোধনে অন্নবস্ত্রাদি সমাস্যার সমাধানে আশুফলপ্রদ কর্মপন্থা গ্রহণ না করিলে ভারতের সাত লক্ষ পল্লীর পল্লীবাসীর জীবন ধারণ সমস্যা অতীব কঠিন হইয়া পড়িবে। বর্তমানেই ইহা এতো কঠিন হইয়াছে যে আর দেরী সহে না। আমরা সংক্ষেপে তাহার আধুনিক সমস্যাগুলির ও তাহাদের প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করিতেছি। এই সব সমস্যা রাষ্ট্রীয় সরকার এবং জনসাধারণ উভয়ে মিলিয়াই দূর করিতে পারেন। ভারতের জনসাধারণ বিদেশী শাসন ও শোষণে এবং কুটনীতির কারসাজিতে কেবল যে নিশ্চেষ্ট, সরকারমুখাপেক্ষী এবং অকর্মণ্য হইয়াছে তাহা নহে, বিদেশী বণিক রাজের কূটনৈতিক মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ছল, চাতুরী, গুণ্ডামী, ভোগবাদের শিষ্যও তাহারা হইয়াছে অত্যধিক ব্যাপকভাবে। ইহার আমূল সংশোধন ও পরিবর্তন পৃথিবীর সামগ্রিক সর্বজাতীয় আন্তরিক চেষ্টা ও উদ্যম ব্যাতিরেকে সম্ভব নহে।

১। ভারতের অন্নবস্ত্রাদি সমস্যার প্রধান কারণ গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সে যুদ্ধের পরে নামমাত্র শান্তি আসিয়াছে। কিন্তু তলে তলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য রণপ্রস্তুতিতে সমগ্র পৃথিবীর রাষ্ট্র সমূহ প্রধানতঃ দুই দলে ভাগ হইয়া পড়িয়াছে। একদলের মাতব্বর সোভিয়েট রাশিয়া আর তাহার পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রসঙ্গী সমূহ; আর অপর দলে ইংলণ্ড ও আমেরিকা এবং তাঁহাদের রাষ্ট্রসঙ্গী সমূহ। এই ভাবী যুদ্ধের বল পরীক্ষার জন্য যে জাতিগোষ্ঠী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ফলে সব দেশেই সব রাষ্ট্রেই সাময়িক ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে জীবন ধারণের অন্নবস্ত্রাদি

উৎপাদনের আয়োজন কমিয়া গিয়াছে। বর্তমান পৃথিবীর দুই শত কুড়ি কোটি লোকের মধ্যে অন্তত পক্ষে দুই শত দশ কোটি লোক যদি পশু ও দানব প্রকৃতি যুদ্ধলোলুপ নেতাদের রণকণ্ডূয়ন প্রবৃত্তি সংযত করিতে পারে, তবে বিশ্বযুদ্ধ সহজেই থামিয়া যাইবে এবং তাহার পরিবর্তে ধনোৎপাদন, অন্নবস্ত্রাদির উৎপাদন যদি সামরিক মারণ অস্ত্র উৎপাদনের পরিবর্তে পৃথিবীর সব রাষ্ট্রক্ষেত্রেই প্রচলিত হয় তবেই পৃথিবীর সর্বত্র অন্নবস্ত্রাদির অভাব এবং ভারতের ও পাকিস্তানের ও অন্নবস্ত্রাভাব বিদূরিত হইবে। বর্তমান পৃথিবীর অন্তত দুইশত দশ কোটি লোক আনবিক যুগের অসাধারণ লোক বিধ্বংসী পশুযুদ্ধ বা দানব সমর চাহে না। মাত্র অল্পসংখ্যক পশুপ্রকৃতির বা দানব প্রকৃতির রাষ্ট্রনেতাগণ প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রেই সমস্ত জনসাধারণকে অন্ধের মত পরিচালনা করিয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে নামাইবার আয়োজন করিতেছেন। এইসব ভণ্ড, কপট, প্রবঞ্চক, অমিতব্যয়ী, খুনে ডাকাত দল শান্তির ধ্বজাধারী হইয়াই যতো অশান্তি আনিতেছেন। একটা অভিনব মানব তন্ত্রের বিশ্বরাষ্ট্র সম্মেলন সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের যথার্থ প্রতিনিধি লইয়া যদি গঠিত হয়, যাঁহারা মারণ বস্তুর উৎপাদন স্থলে রক্ষণ বস্তুর উৎপাদনে ও সর্বত্র তাহার সমবণ্টনে প্রস্তুত থাকিবেন, তবেই এই সমস্যা সহজে পূরণ হইবে। সমগ্র পৃথিবার অধিকাংশ লোক যতদিন এই বিশ্বমানবতার পূজারী এবং ভাবুক না হইতেছেন ততদিন তাহা সম্ভব নহে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যোদ্ধা সৈন্য না গড়িয়া শান্তি সৈন্য, যাহারা মানুষে মানুষে পশুর লড়াই করিতে দিবে না, এই রূপ যথার্থ শান্তিপ্রিয় শান্তি সৈন্যচমূ সব রাষ্ট্রেই গড়িতে হইবে। ভারত রাষ্ট্র নিজে এই আদর্শবাদী হইয়া কর্মক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ করিলে তাহার ভাব ও আদর্শ শিষ্য সংখ্যা পৃথিবীর সব রাষ্ট্রে বাড়িতে থাকিবে। ইউ. এন. ও. যাহা পারিতেছন না, ভারত তাহা পারিবে।

২। ভারতেও এতো অন্ন বস্ত্র সমস্যা প্রবল হইত না যদি ভারত

দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত না হইত। ভারত বিভাগের ফলে হিন্দুস্থান ভারত ও পাকিস্তান দুই শত্রুস্থানে পরিণত হইতে যাইতেছে। পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের ফলে উভয় রাষ্ট্রেই যে অন্নবস্ত্রাদি অভাব খুব বেশী হইয়াছে ইহা মূর্খেও বুঝে। যে রাষ্ট্রনৈতিক দুরভিসন্ধিতে ইহা করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ দূর না করিলে এই দুই রাষ্ট্রের অন্নবস্ত্রাদি অর্থ সমস্যার পূরণ হইবে কি করিয়া? পাঞ্জাবে লোক বিনিময়ের ফলে শতাধিক কোটি টাকা বৃথা ব্যয় হইয়াছে আর সহস্রাধিক কোটি টাকা আশ্রয়প্রার্থীদের নষ্ট হইয়াছে। বাংলাতেও তাহা হইবার উপক্রম করিতেছে এবং অনেকখানি হইয়াছে। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ যে পরস্পরের শত্রু হইতে দাঁড়াইয়াছে এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধে লিপ্ত হইবার উপক্রম করিতেছে তাহার প্রধান দায়ীত্ব পাকিস্তানের নেতাগণের এবং পাকিস্তানের উভয় সম্প্রদায়ের লোক গণের। পাকিস্তানের অত্যাচারে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা বাস্তভিটা সব ত্যাগ করিয়া ১৫।২০ লক্ষ লোকের এক বিরাট সমষ্টি যে পশ্চিম বঙ্গাদিতে আসিয়াছে, তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের অন্নসমস্যা ১৩৫০ সালের পঞ্চাশের মন্বন্তরের বা দুর্ভিক্ষে পরিণত হইতে পারে। ইহার পরিণামে দুই বাংলার অধিবাসী বিনিময় হইলে পাঞ্জাবের দুর্দশা অধিকতর ভাবে বাংলাতেও আসিবে।

এই সমস্যা সমাধানের দুইটী মাত্র উপায় আছে। (ক) হিন্দুস্থান ভারত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের পুনর্মিলনে। কিন্তু মুস্লীম লীগ নেতৃত্ব তাহা কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। ভারতীয় একরাষ্ট্র জাতিতত্ব বা One Nation theory না মানিলে উহা সম্ভব নহে। কিন্তু মুস্লীম লীগ নেতৃত্ব দুই রাষ্ট্র জাতিবাদ (Two Nation theory) ত্যাগ করিলে তাঁহাদের নেতৃত্ব ও স্বার্থ নষ্ট হইবে। কাজেই মানবতন্ত্রের দিক দিয়া তাঁহারা তাহা ভাবিবেন না বা কাজে পরিণত করিবেন না। ফলে উভয় রাষ্ট্রেই শত্রুতা বৃদ্ধি

এবং রণপ্রস্তুতি চলিতেছে এবং চলিতে থাকিবে এবং তাহার ফলে অন্ন বস্ত্রাদি ধনোৎপাদনের অনেকখানি স্থান সমর দ্রব্য উৎপাদনে গ্রহণ করিবে। উভয় রাষ্ট্রের যথার্থ শান্তিপ্রিয়, হিন্দু-মুসলমান মিলনকামী অধিকাংশ জনগণ যদি রাষ্ট্র ক্ষেত্রে যথার্থ রাষ্ট্র নিয়ন্তা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার না হন, তবে তাহা কেবল আদর্শের স্বপ্ন বিলাসই থাকিবে। এই আদর্শের পরিকল্পনা ও ভাবোন্মাদনা, অনুপ্রেরণা যদি সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দুমুসলমানের প্রাণের উপর রেখাপাত করিতে থাকে, তবে রাষ্ট্রীয় প্রভুশক্তির পশুবলে তাহা দমিতে হইবে না। এই আদর্শে ও ভাবে যদি পুনর্মিলন আদৌ সম্ভব না হয়, তবে দ্বিতীয় পন্থা দেখিতে হইবে। (খ) ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধিবাসী হিন্দু মুসলমান সকলে মিলিয়া যৌথভাবে আন্তরিক যুদ্ধবিরতি ও রণকণ্ডুয়ণ প্রবৃত্তি কমাইয়া, মিথ্যা বিজ্ঞাপন আর মিথ্যা শত্রুতার বাগ্‌জাল রচনা না করিয়া পরস্পরের সাহায্যে কাঁচামাল ও উৎপন্নদ্রব্যাদির বিনিময়ে অন্নবস্ত্রের সমাধান করিতে পারেন। উৎসাদন শক্তি কমাইয়া দুই রাষ্ট্রই উৎপাদন শক্তি বাড়াইবার শান্তি অভিযান যদি না করিতে পারেন, তবে দুই রাষ্ট্রের নেতাদের মহামূর্খতা, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা, মানসিক নীচতাই মাত্র প্রকাশ পায় না; সমগ্র বাঙ্গালী জনসাধারণেরও তাহা প্রকাশ পায়। বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান উভয়কে আজ কর্তব্য নির্ধারণ করিতে হইবে—আমরা পরস্পরের উৎসাদন দ্রব্যই প্রস্তুত করিব বেশী, না জীবন বাঁচানর উৎপাদনই করিব বেশী। উভয় রাষ্ট্রে শত্রুতা, লোক বিনিময়, বাস্তুভিটা ত্যাগ বন্ধ হইলেই শান্তির আবহাওয়ায় উভয় রাষ্ট্রেই অন্নবস্ত্রাদি প্রচুর উৎপন্ন হইতে পারিবে। এই রাষ্ট্রীয় সমস্যার পূরণেই যথার্থ অন্নসমস্যাদি পূরণ সহজ হইবে।

৩। বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের প্রধান কারণ রাষ্ট্রীয় কারণ ব্যতিরেকে অপর কারণ কর্মক্ষেত্রে চারিটী। (ক) শ্রমিক মালিক বিরোধ

(খ) কৃষি শিল্পাদির উৎপাদন হ্রাস (গ) মুদ্রাস্ফীতি (ঘ) চোরা কারবার, অমিতব্যয়িতা, ধনলোভাদি চারিত্রিক দুর্নীতি ব্যক্তিসাধারণের, অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের ও রাষ্ট্রের।

(ক) শ্রমিক মালিক বিরোধের প্রধান কারণ ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা ও অত্যধিক ধনলোভ। অন্নবস্ত্রাদির দাম অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে হইলে আয়, দিন মজুরী বা মাসিক বেতন বৃদ্ধি অনিবার্য। শ্রমিকেরা ইহাই চাহিতেছে। মালিকেরা নানাভাবে অকাজ, কুকাজ করিয়াও যথেষ্ট অর্থ লাভ করিয়াছেন এবং ধনসঞ্চয় করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। গোয়ালা যদি বাছুরকে উপবাসী রাখিয়া তাহার ভবলীলা সাঙ্গের আয়োজন করিয়া গরুর সবটা দুধেই অতিলোভ করে তবে তাহার গোবংশ ধ্বংশ হইবে ইহা নিশ্চয়। যে সব শ্রমিক ধনোৎপাদন করিবে তাহারই যদি না খাইয়া; শীতে লেংটা হইয়া মরিয়াই যাইতে থাকে বা কর্মশক্তিতে দুর্বলই হইতে থাকে, তবে তুমি মালিক ধনবৃদ্ধি, ধনোৎপাদন করিবে কাহাদের দিয়া? অনেক আন্দোলন, আইন প্রণয়ন পরে শ্রমিকের বেতনাদি বৃদ্ধি অনেক ক্ষেত্রে হইয়াছে। আপনাদের শক্তির, সঙ্ঘশক্তির আস্বাদ পাইয়া তাঁহারাও যদি মূল কারবারের লাভ লোকসান এবং উৎপাদনের শক্তি বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল অর্থলোভে বেতন বৃদ্ধির অসঙ্গত দাবী করিতে থাকেন এবং একদল বিদেশী রাষ্ট্রঅর্থে পালিত, বিদেশী রাষ্ট্র স্বার্থে নিয়োজিত সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের মুখোস আর অসামাজিক ও বৈষম্যভরা শ্রমিকক্ষেপানতন্ত্রের কবলে পড়িয়া সমগ্র উৎপাদন যন্ত্রগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে দিতে থাকেন, তবে ওই যন্ত্রের শ্রমিক বৎসগুলির উপবাস ও অকালমৃত্যু অনিবার্য। উভয় পক্ষের ধনলোভ বা কুবের শিষ্যত্ব ত্যাগ, যথার্থ শিব বা শুভ শিষ্য হইয়া ধনবণ্টনের যথাসম্ভব সমতা অবলম্বন করিলে, এই শ্রমিক মালিক বিরোধ সহজেই

৮

মিটিবে। তাহার ফলে অন্নবস্ত্রাদি উৎপাদন অনেক বাড়িয়া যাইবে, যাহার ফলে শ্রমিকেরাও পেট ভরিয়া খাইবে, 'পাছা ভরিয়া কাপড় পরিবে আর ভাল ঘরে মাথা গুঁজিবে। শ্রমিক মালিকে, মানুষে মানুষে প্রাণের দরদ, যথার্থ সহানুভূতি যদি বাড়ান যায়, তবে এই উন্নত মানবতার দ্বারাই, মানবতন্ত্রের দ্বারাই শ্রমিক মালিক বিরোধ নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে। ঝগড়াটে, মারামারি প্রিয় ভূত প্রেত বা বানর লইয়া কোন্ সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ? মানুষের সমাজে মানুষে মানুষে যদি সহমর্মিতা, সহ অনুভূতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম না বাড়িল তবে সমাজে সমাজে ঝগড়া, মারামারি খুনে রক্তলীলা (class-warfare) চালাইয়া কোন্ বাঘ ভালুকের সমাজের সমাজতন্ত্র, শতভেদ বৈষম্যের, রাজনৈতিক শত জাতি ভেদ নীতির, শত শ্রমিক ধনিক, মালিক কর্ম্মচারী, কৃষক জমিদার, রাজা প্রজার শত বৈষম্যের সাম্যবাদ? সর্বজাতিক, সর্বদেশিক, মানুষে মানুষে ব্রহ্মতান্ত্রিক সর্বদর্শন ব্যতিরেকে যথার্থ সাম্যবাদ সম্ভব নহে। কাজেই বর্তমান যুগধর্ম মানবতন্ত্র, ব্রহ্মতন্ত্র। তাহার আচরণ ও জীবনবেদে প্রচার কোন্ মানব গোষ্ঠী, রাষ্ট্রজাতি, বিশ্বজাতি করিবে তাহাই বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়, অনুধাবনীয়, অনুশরণীয়।

(খ) শ্রমিক মালিক, ধনিক শ্রমিক, কৃষক মনিব, শিল্পী শিল্পপতি প্রভৃতির অন্তর্বিরোধ মীমাংসা হইলে কৃষি শিল্পাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমানে ইহাদের ঝগড়া আর বিরোধের ফলে উৎপাদন কিরূপ হ্রাস পাইয়াছে তাহা দেখুন:—

কৃষি উৎপাদনের হিসাব ভারতে

সাল	কোটীটন পরিমাণে
১৯৪৫	৪·৪০
১৯৪৬	৪·০০
১৯৪৭	৪·১০

কয়েকটী শিল্প উৎপাদনের হিসাব ভারতে

সাল	বস্ত্র কোটীগজ	ইস্পাত টন	সীমেণ্ট টন
১৯৪৫	৪৮০	১১,৮০,০০০	১,৬০,০০০
১৯৪৮	৩৮০	৮,৭৫,০০০	১,১২,০০০

'ক্যাপিটালে'র শিল্প প্রচেষ্টার স্থচক সংখ্যা এবং ইষ্টার্ন ইকনমিষ্টে প্রকাশিত শিল্পপ্রচেষ্টার সর্বশেষ স্থচক সংখ্যা হইতে দেখা যায় যে কৃষিজাত দ্রব্যের তুলনায় শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন অনেক কম। ক্যাপিটালের স্থচক সংখ্যানুসারে (বেস বা মূল বিন্দু ১০০) ১৯৪৫—১৯৪৬ সালে উহা সর্বোচ্চে উঠিয়া স্থচক সংখ্যা ১২৭.৫ হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীতে দাঁড়ায় ১০৯.১৯। ইষ্টার্ন ইকনমিষ্টের হিসাবে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন ১৯৪৩-৪৪ সালে সর্বোচ্চে উঠিয়া হয় ১২৬.৮; ১৯৪৮ সালের মার্চমাসে উহা কমিয়া হয় ১০৬.৫।

পশ্চিম বাংলায় উৎপন্ন ফসলের পরিমাণঃ—

সাল	টন		
১৯৪৪—	৪২ লক্ষ	২১	হাজার
১৯৪৫—	৩৫ ,,	১০	,,
১৯৪৬—	২৮ ,,	৯৫	,,
১৯৪৭—	৩৬ ,,	৪৮	,,
১৯৪৮—	৩৪ ,,	১৭	,,

পশ্চিম বাংলায় ১৯৪৮ সালে মোট ধান উৎপন্ন হইয়াছে ৩৪ লক্ষ ১৭ হাজার টন। ইহার মধ্যে বীজ ধানের জন্য ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার টন বাদ দিলে মোট ব্যবহার উপযোগী ফসলের পরিমাণ হয় ৩০ লক্ষ ৮০ হাজার টন। মাথাপ্রতি দৈনিক মাত্র ১৪ আউন্স হিসাবে সমগ্র পশ্চিম বাংলায় মোট প্রয়োজন ৩৬ লক্ষ ৮০ হাজার টনের। অতএব এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গে ধান চালের ঘাট্‌তি ৬ লক্ষ টন। এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গে গমের মোট চাহিদা ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টন অথচ উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র ২৫ হাজার টন। এই ঘাট্‌তি পূরণের জন্যই ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৮ সালে বরাদ্দ করিয়াছেন ৮০ হাজার টনের কিছু বেশী চাউল এবং ২ লক্ষ টনের কিছু

বেশী গম ও গমজাত দ্রব্য। পশ্চিম বাংলায় এই অন্নসমস্যা অত্যধিক বাড়িতেছে, ১৫ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ হিন্দুর পূর্ব-পাকিস্তান পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে অভিযান করায়। ক্ষুধিতের এই অভিযানে রাষ্ট্র সমস্যা ও অর্থ সমস্যা উভয়ই কারণ। পাকিস্তান কর্তারা উহা সম্পূর্ণ ভুল, রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজ, খবরের কাগজওয়ালাদের অঙ্কস্ফীতি বলিয়া সমস্যা অস্বীকার করিতেছেন— ইহার পরিণাম সম্বন্ধে অজ্ঞ, অন্ধ হইয়া। এই ক্ষুধিতের অভিযানে যে ক্ষুধার আগুন জ্বলিতে পারে তাহাতে উভয় বঙ্গই পুড়িবে বা পুড়িতে পারে পাঞ্জাবের মতো। মূল রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান করিয়াই অন্নসমস্যার সমাধানে চাই অন্ন উৎপাদনের বিপুল অভিযান, শিল্পাদি উৎপাদনের বিশাল অভিযান গোটা বাংলায়, সমগ্র ভারতের হিন্দুস্থানে পাকিস্তানে। ধনোৎপাদনের এই বাস্তবক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংগ্রামের সঙ্কীর্ণতা, নীচতা যাহারা আনিবে তাহারাই হইবে রাষ্ট্রীয় খুনে ডাকাতের দল যাহারা মানুষ রক্ষণের আয়োজন না করিয়া মানুষ মারণের আয়োজন করিতেছে অত্যধিক। ক্ষুধিত পেটের আগুনে হিন্দু মুসলমান উভয়েই পুড়িবে। ভুড়ি গরম হইলে মুড়ি গরমও হয় যাহার ফলে রক্তের গঙ্গা বহিতে পারে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের বুকে শ্মশানস্থান, গোরস্থান রচনা করিয়া। উভয় বঙ্গ, উভয় হিন্দুস্থান পাকিস্তান রাষ্ট্র ধনোৎপাদনে, খাদ্যোৎপাদনে, শিল্পোৎপাদনে মিলিলে সেই মিলন ভিত্তির উপর রাষ্ট্রীয় মিলন সহজ, সুসাধ্য হইবে।

(গ) মুদ্রাস্ফাতি যে অত্যধিক হইয়াছে তাহাতো সবাই স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু হইল কেন ? সরকারের ব্যয় যদি বাড়িয়া যায় আর আয় যদি কম হয় তবে কাগজের নোটাদি মুদ্রার সংখ্যা বাড়ানোতেই মুদ্রাস্ফীতি হয়। মুদ্রাস্ফীতির যথার্থ মানে মুদ্রার মুল্যমানের কম দাম অর্থাৎ সস্তা মুদ্রার দাম। পঞ্চাশ বৎসর আগে যেখানে টাকায় ২০।২১

সের চাউল পাওয়া গিয়াছে সেখানে টাকায় এক সের চাউল পাওয়া মানে টাকা মুদ্রাটার দাম প্রায় তিন পয়সা হইয়াছে। গভর্ণর ভান্সিটার্ট নবাব মির জাফরকে চন্দন নগরের নিকট গরুটিতে যখন অভ্যর্থনা করেন তখন প্রতি টাকায় ২১ সের চাউল পাওয়া যাইত অর্থাৎ একসের চাউলের দাম ছিল তিন পয়সা মাত্র (এই পুস্তকের ১৩পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এক টাকার একখানা নোট বা মুদ্রার দাম প্রকৃত-পক্ষে বর্ত্তমানে পূর্ব্বের তিন পয়সার মূল্য। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী করিয়া সরকার যখন 'ফাজিল' হন তখন তাঁহাকে যথেচ্ছ নোট বা মুদ্রা ছাপাইতে হয়। গত দশ বৎসরের নোট প্রচলনের হিসাব দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

নোট প্রচলনের হিসাব

সাল—		মোটপরিমাণ কোটী টাকায়		ব্যাঙ্ককৃত ক্রেডিট কোটী টাকায়
১৯৩৮-৩৯	—	১৮২	—	১৩০
১৯৪৪-৪৫	—	৯৬৯	—	৫৮৪·৮০
১৯৪৬-৪৭	—	১,২২৩	—	৭২৬
১৯৪৮ জুন পর্যন্ত—		১,৩২০	—	৭৮০·৭০

এই মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিতে হইলে সরকারের ব্যয় আয় অনুযায়ী করিতে হইবে অর্থাৎ ব্যয়ের অনাবশ্যক বহর কমাইতে হইবে। স্বাধীন ভারতে দেশী নেতাদের আমলেও যদি প্রধান রাষ্ট্রপালের বেতন মাসিক প্রায় কুড়ি হাজার টাকা থাকে তবে ব্যয় কমিবে কি করিয়া? প্রধান কর্তাদের দরুণ খরচ ইংরাজ আমলের মতোই থাকিলে ক্ষুধে কর্মচারীদের বেতন কমাইয়া আর কতই বা ব্যয় কমান যাইতে পারে? কর্তারা জনসাধারণকে সঞ্চয় কর বলিতেছেন, কিন্তু কর্তারাই যদি অমিতব্যয়ী হইয়া দেউলিয়া হবার উপক্রম করেন তবে তাঁহাদের এই আচরণের কথা শুনিবে কে? সরকার

যদি প্রচুর স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধন মজুত রাখিয়া এবং অতিরিক্ত খাদ্য দ্রব্য ও শিল্পদ্রব্যাদি উৎপাদন করিয়া নিজ নিজ রাষ্ট্রের প্রয়োজন মিটাইয়া বিদেশে মাল রপ্তানী করিয়া স্বর্ণাদি ধনাগম করিতে পারেন, তবেই রাষ্ট্র যথার্থ ধনসম্পদশালী হইতে পারে। ভারত, হিন্দুস্থান পাকিস্তান ভারত অন্নবস্ত্রাদি উৎপাদনে স্বাবলম্বী না হওয়া পর্য্যন্ত সে বিদেশে তাহা রপ্তানী করিবে কি করিয়া ?

(ঘ) রাষ্ট্র ও তাহার কর্ণধারগণ যদি দুর্নীতিপরায়ণ, ধনলোভী, অমিতব্যয়ী, চোরাকারবারী, মুনাফা শিকারী হয়, তবে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ক্ষুদে নেতাগণ এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীগণ পর্যন্ত দুষ্ট ও দুর্নীতি পরায়ণ হন। কাজেই এখানে নৈতিক ধর্ম বা শীল নীতির প্রশ্ন উঠে। পৃথিবীর দুই প্রধান রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকা রাষ্ট্রক্ষেত্রে ধর্মের কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। তথাকথিত কম্যুনিষ্ট সোভিয়েট রাশিয়া রাষ্ট্র হইতে ধর্মকে (এবং শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি, বিশ্বাসকেও) জড়বাদে একেবারে বিসর্জন দিয়াছেন। রাষ্ট্র ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রবঞ্চনার নাম 'ডিপ্লোম্যাসি,' রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, ভাইয়ে ভাইয়ে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঝগড়া মারামারি বাধাইয়া যুদ্ধ ক্ষেত প্রস্তুতির নাম সন্ধি, শান্তি, 'পীস' ; ঘুস দিয়া টাকা দিয়া নিজের দলভুক্ত করার নাম সাহায্য 'এড্', তলে তলে মিথ্যা প্রবঞ্চনায় আণবিক বোমার বহর বাড়াইয়া আর নৌবহর, অস্ত্রবহর, উড়োজাহাজ, সাবমেরিন আদি রণসম্ভার বাড়ানর গাল ভরা নাম যুদ্ধ বিরতি ; গোপন পকেটে পকেটে আণবিক বোমা, ব্যোমরশ্মির মারণ ফর্মুলা আর মানুষের খোলে বাঘ ভালুকের সম্মেলনে সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলিকে বলে 'উনো' বা সম্মিলিত জাতি পরিষদ। রাশিয়া ধর্মকে ও শীলনীতিকে গদিচ্যুত করিয়া, যীশু খৃষ্টের শান্তি সিংহাসনে মার্কস লেনিনের নব ধর্মমতবাদ বা Leninixm, Marxism এর শ্রেণীহীন সমাজ (Classless society) করিবার জন্য সব রাষ্ট্রের

সব সমাজ ভাঙ্গিয়া কম্যুনিষ্ট সমাজে এক শ্রেণী করিতে চাহেন। তাহার ফলে চীনে, গ্রীসে, ইটালীতে, ইন্দোনেশিয়ায়, বর্মায় গৃহবিবাদ, মারামারির অযুত উস্কানি, আর সক্রিয় সমর্থন। আর তাহার পাল্টা জবাবে ইংরাজ মার্কিন এণ্ড কোং এর 'কমন ওয়েল্‌থ' এ সোভিয়েট বিরোধী ব্লকগঠন। সর্বত্রই কাঁঠালকোষ খাওয়ার শিয়ালী সজ্ঞ। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ভারত ওই 'কমন ওয়েল্‌থে' সাধারণ ধনের বখরা বা ঘুষ বা এড্ যদি ভাল রকমেই না পায় তবে তাহার জাতিও যাইবে, পেটও ভরিবে না। সোভিয়েটের ভাব শিষ্যেরা হায়দারাবাদে গণ্ডগোল পাকাইতে না পারিয়া এখন ভারতের ফরাসী উপনিবেশ, বার্মায় আর ইন্দোনেশিয়ায় মন দিয়াছেন। ভারত রাষ্ট্রে আর পাকিস্তানে 'কম্যুনিজম্ এর স্থান দখল করিতেছে 'কমুন্যালিজম্' 'প্রভিন্‌সিয়ালিজম্', সাম্প্রদায়িকতা আর প্রদেশিকতা। সবাই সবাইকে কদর্য ভাষায় অশ্লীল বাক্যে গালাগালি দিতেছে আর নিজের স্বার্থ বহাল রাখিবার জন্য অপরের মুণ্ডপাত করিরতেছে আর শত রকমের চোরাকারবার, কালাবাজার, মুনাফাশিকারাদির দ্বারা মানুষ শিকারও করিতেছে। ধর্মের, যথার্থ ধর্মের অপেক্ষা করিতে গেলে, তাহাকে রাষ্ট্রীয় জীবনে, সমাজ জীবনে ও ব্যক্তি জীবনে মানিতে গেলে চলে না, তাই তার নাম ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। উঁহাদের ধর্মের মানে দাঁড়াইয়াছে বিশিষ্ট মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের দোহাই দেওয়া সাম্প্রদায়িকতা আর প্রাদেশিকতা। নিজ সম্প্রদায়, আর প্রদেশকে ভালবাসা, তাহার যথার্থ মঙ্গলের জন্য কাজ করা কি অধর্ম ? স্বপরিজন, স্বপরিবার, স্বপ্রদেশ, স্বরাষ্ট্র কাহাকেও ভাল বাসিব না অথচ 'স্ব-রাজ'কে ভাল বাসিব কেমন করিয়া ? যাহার 'স্ব' নাই তাহার যে কিছুই নাই। মাথা নাই তার মাথা ব্যথা। নিজ নিজ সম্প্রদায় ও প্রদেশকে ভালবাসা আদৌ দোষের নয়, যদি পরকে, পর সম্প্রদায়, পর জাতি, পর প্রদেশ, পর দেশ, পর রাষ্ট্রকেও তাহাদের

গুণমূল্য দিয়া শ্রদ্ধা করি, ভালো বাসি। মানবে মানবে সত্য আচরণ, অতিলোভ ত্যাগ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরী, খুনে ডাকাতী, নর-হত্যা, মানুষ শিকার করা ত্যাগ যথার্থ ধর্ম। এই ধর্ম বাদ দিয়া কোন্ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়িবে নেতাগণ? রাষ্ট্র ধর্ম পালন না করিয়া ধার্মিক ব্যক্তির, সাধু ব্যক্তির ন্যায় যদি পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাষ্ট্র এবং বিশেষভাবে ভারত রাষ্ট্র, যথার্থ ধার্মিক রাষ্ট্র, সাধু রাষ্ট্র না হইতে পারে, তবে তাহার মৃত্যু; প্রলয় অনিবার্য। তাই কংগ্রেস কর্মীগণ, দেশ ও রাষ্ট্রসেবকগণ তোমরা যথার্থ ধার্মিক রাষ্ট্র গঠন কর সমস্ত দুর্নীতি ও চরিত্র সংশোধন করিয়া। এবার জয়পুর রাষ্ট্র সভার সভাপতিত্বের ভোট সংগ্রামে যিনি মাত্র ১১৪ ভোটে ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার নিকট পরাজিত হইয়াছেন (ডাঃ পট্টভি পান ১১৯৯ ভোট আর ট্যাণ্ডন পান ১০৮৫ ভোট), তাঁহারই অশ্রুভরা এক জ্বালাময়ী আবেদন দিতেছি—"অদ্য সকালে এখানে (এলাহাবাদে-সঃ) এক কংগ্রেসপন্থীদের সভায় যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি ও স্পীকার শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন বক্তৃতা প্রসঙ্গে কংগ্রেস সেবীদের মধ্যে দুর্নীতি, জুয়াচুরি ও আত্মীয় প্রীতি সম্পর্কে উল্লেখ করেন। তখন তাঁহার গণ্ডদেশ দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুজল গড়াইতে থাকে এবং তাঁহার কণ্ঠ বন্ধ হইয়া আসিতে থাকে। তিনি নিজেকে সংযত করিয়া বেদনায় কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসা করেন, ইহা কি স্বরাজের পুরস্কার? ইহার জন্যই কি আমরা সংগ্রাম করিয়াছি, লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছি ও প্রাণপাত করিয়াছি? আমি যদি আগে জানতাম যে আমাদের দেশভক্তদের এত অধঃপতন হইবে, তাহা হইলে, আমি দাস থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করিতাম। যে কংগ্রেস সেবীরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে এবং যাহারা দেশভক্ত বলিয়া দাবী করিয়াছে তাহাদের মধ্যে দুর্নীতি দেখা দিয়াছে। তাহাদের এই দুর্গতির কথা যখন শুনি তখন আমার অন্তর কাঁদিতে থাকে এবং আমার নিজকে অসহায় বোধ করি।"—আঃ বাঃ পঃ দৈঃ ৬পৃঃ,

২৫।৫।১৩৫৫। ধার্মিক ভারত এই সব দুর্নীতি ও অধর্ম্মকে প্রাণপণে রোধ করিলে অন্নসমস্যা সহজেই পূরণ হইবে।

অমিতব্যয়িতার পাপে, আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী করিয়া যেমন ব্যক্তি, পরিবার ধন সঙ্কটে, নানা দুরবস্থায় পতিত হন, তদ্রূপ রাষ্ট্রও আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী করিয়া, অমিতব্যয়ী হইয়া অর্থ-সঙ্কট আনিয়া দেউলিয়া হইবার উপক্রম করেন, যাহার পরিণামে সে রাষ্ট্র বৈদেশিক পরাধীনতাও ডাকিয়া আনেন। এই জন্যও রাষ্ট্রকে মিতব্যয়ী হইতে হইবে, তাহার আয় অনুপাতে ব্যয় করিয়া। ভারত রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে সাবধান এখন হইতেই হইতে হইবে। ভারত গভর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে কি পরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত ব্যয় হইতেছে তাহা সময় থাকিতে সবিশেষ প্রণিধান করিয়া তাহা কমাইতে হইবে। রাষ্ট্র সচিব শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ সিংহ সমস্তিপুরে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর জন্য বার্ষিক ২০০ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে। কাশ্মীরের জন্য ব্যয় হইতেছে প্রতিমাসে ৬ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া সস্তায় সরকারী কর্ম্মচারীর রেশন সরবরাহের জন্য গিয়াছে বার্ষিক ২২ কোটি টাকা।.........আশ্রয় প্রার্থীর বাবদে এখনও দৈনিক ১৫ লক্ষ টাকা খরচ হইতেছে।" (আ. বা. প. দৈ, ৪পৃঃ ১২।১০।১৩৫৫) অর্থাৎ খাদ্য ও শস্যের দরুণ বার্ষিক ২০০ কোটি টাকা, কাশ্মীরের জন্য বার্ষিক ৭২ কোটি টাকা, সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য বার্ষিক ২২ কোটী টাকা এবং আশ্রয় প্রার্থীদের বাবদে বার্ষিক ৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ৩৪৮ কোটি টাকা ভারত সরকারের ব্যয় হইতেছে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা আয়ের মধ্যে। এই সমস্ত খরচ না কমাইলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গঠনমূলক কর্ম্মে কি ব্যয় হইবে? কাশ্মীরের যুদ্ধ আপাতত থামিয়াছে। কিন্তু খাদ্য শস্য উৎপাদন করিয়া বার্ষিক ২০০ কোটি টাকা বাঁচাইতে না পারিলে

ভারত রাষ্ট্রের কল্যাণ নাই। পাকিস্তানের দুর্দশা আরও বেশী। কাজেই তাহাকেও খাদ্য শস্যে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। কিন্তু দুই রাষ্ট্রে গুঁতোগুঁতি আর অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রাম চালাইলে তাহা সম্ভব হইবে কি করিয়া ?

পল্লীসন্তান বেদনায় রুদ্রকণ্ঠে আরক্ত লোচনে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"ভাতের ক্ষেত কই ?"

ভাতের ক্ষেতের সমস্যাও আজ কতো মারাত্মকভাবে কঠিন হইয়াছে তাহাও সবিশেষ চিন্তনীয়। এ সম্বন্ধে আমরা এক লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই আমাদের বক্তব্য বলিতেছি এই দিকে সরকারের ও সকলের আশু দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য। "The total area of British India is 687 million acres. 22 percent of this is land totally unfit for cultivation, 3 percent is covered with forests (state owned) and 7 percent is current fallow. The land used for arable farming is 232 million acres, ie. 35 percent of the whole. Actually the gross sown area is 267 milllion acres, the difference representing the area that is cropped twice a year. 80 percent of the land cultivated is given to cereals, pulses and sugar, nearly all of which is consumed in India. Agricultural research has been chiefly directed, however, not to these food crops but to crops raised primarily for export, such as cotton and jute, linseed, tea and coffee. It is " essentially dominated by the motive of producing cheap raw producc for the benefit of the British commerce and the Indian bourgeoisie" 18 (F. N. 18.

Health and Nutrition in India, N. Gangooly, p. 26 (1939)]—The Problem of India, (Dr.) K. S. Shelvanker (1940) p. 35. বৃটিশ ভারতে মোট জমির পরিমাণ ৬৮ কোটী ৭০ লক্ষ একর। ইহার শতকরা ২২ ভাগ জমি চাষের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, শতকরা ১৩ ভাগ বনাকীর্ণ (সরকারের খাসে) এবং শতকরা ৭ ভাগ চল্‌তি পতিত। কর্ষণ যোগ্য জমি ২৩ কোটি ২০ লক্ষ একর অর্থাৎ মোটের শতকরা ৩৫ ভাগ। প্রকৃত পক্ষে সমুদয় বোনা জমি ২৬ কোটি ৭০ লক্ষ একর। এই পার্থক্যের কারণ যে জমিতে বৎসরে দুইবারে ফসল লওয়া হয় তাহা লইয়া। কর্ষিত জমির শতকরা ৮০ ভাগ রবিশস্য, কলাই এবং চিনির জন্য—যাহার প্রায় সবই ভারতে ব্যয়িত হয়। কৃষি সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান এই সমস্ত খাদ্য শস্য সম্বন্ধে না হইয়া, প্রধানত তুলা, পাট, তিসি, চা ও কফির ন্যায় রপ্তানির জন্য শস্যোৎপাদনেই নিয়োজিত হইয়াছে। "বৃটিশ বাণিজ্যের এবং ভারতীয় 'বুর্জোয়াজি' বা মধ্য শ্রেণীর বণিগ্‌ দলের উপকারার্থে সস্তায় কাঁচা মাল উৎপন্ন করিবার মতলবের আধিপত্যে মূলত ইহা হয়।" ঐ জমির শতকরা ২৩ ভাগ বর্তমানে বোনা জমির ⅙ অংশের উপরের সমান জমি কর্ষণ যোগ্য, কিন্তু এখনও তাহা কর্ষিত হয় না। এই শতকরা ২৩ ভাগ জমি কর্ষিত করিবার আয়োজন যেমন পূর্ণভাবে করিতে হইবে, তদ্রূপ 'Intensive Culture' বা জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধিকারক চাষের আধুনিক যুগোপযোগী আয়োজনও করিতে হইবে।

ওই যে বিশাল জন সমুদ্র গর্জ্জন করিতেছে, "ভাত কই; ক্ষেত কই"? তাহার আশু মীমাংসা স্বাধীন ভারতকেই এবং পাকিস্তানকেই অতীব দ্রুত করিতে হইবে। এ দিকে গণসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ আর বিপ্লবগর্জ্জন আরও শক্তিশালী আরও তীব্রতরভাবে হউক নিখিল ভারত পাকিস্তান দিগন্তপ্রসারী, পল্লীগণমনবোধনকারী।

অনন্ত জঙ্গলের অন্তরালে লুক্কায়িত পল্লী গৃহগুলি অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াই যেন ভগবানের মুক্তদান জ্ঞানালোককে অপসৃত করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে সেখানে পাট পচানর ফলে, রক্তবীজের ঝাড় কচুরি পানাদির (water hyacinth) আবির্ভাবের ফলে এবং আমাদের পাপময় অযত্ন ও অবহেলার ফলে পল্লী জলাশয় গুলি 'ব্যাঙের মূতের' আধার হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পল্লীর বাতাসের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কেবল বিষ উদ্গীরণ হইতেছে। এগুলিও যে খাদ্য। পল্লীর শাক ভাতের ব্যবস্থা কেবল করিলে চলিবে না। জল, আলো ও বাতাস রূপ আহার্য গুলিকেও অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থায় রাখিতে হইবে। পূজারী, দশভুজার প্রকৃত পূজা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। ওই যে প্রদীপ, ওই যে ধুনোচি, ওই যে পূর্ণকুম্ভ উহার অর্থ জান ? পল্লী মঙ্গলের পূজার আয়োজনে আমাদিগকে প্রথম গগন প্রদীপ জ্বালাইতে হইবে ; ধূপ ধুনা সুগন্ধি পরিপূর্ণ পবিত্র বায়ুর দ্বারা "মধু বাতা ঋতায়তে" বলিতে হইবে ; আর পূতবারির পূর্ণকুম্ভে পল্লী বা পল্লীরাণীকে "আয়াহি বরদে দেবী ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ, ইহতিষ্ঠ," বলিয়া আবাহন করিতে, প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহার পরে 'অন্নভোগের' ব্যবস্থা এবং ভোগান্তে প্রসাদ বিতরণ। ইহাই প্রকৃত 'মহোৎসব' জাতিবর্ণ নির্বিশেষে। হউক সকাম তবুও চণ্ডীর প্রার্থনার ন্যায় আমাদিগকে প্রার্থনা করিতে হইবে—

"বড় দুঃখ বড় ব্যথা—সন্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ-অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।

—**রবীন্দ্রনাথ, চয়ণিকা**, পৃঃ ১৬০-১৬১।

"দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৩। বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৪। বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি। ১৫।—**শ্রীচণ্ডী**। হে দেবী, আমায় সৌভাগ্য এবং আরোগ্য দাও ও পরম সুখ দাও। আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। হে দেবী আমার কল্যাণ বিধান কর এবং আমাকে বিপুল শ্রী (ঐশ্বর্য) প্রদান কর। আমায় রূপ দাও, জয় দাও, আমার শত্রু নাশ কর। হে দেবী, আমাকে ব্রহ্মবিদ্যাবান্, যশস্বী এবং শ্রীমান কর। হে দেবী, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, এবং আমার শত্রু নাশ কর।

ওঁ শান্তিঃ ওম্।

—০—

আর্য্যসঙ্ঘের সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য (বিনোদপুর ও বালিয়াকান্দি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) কৃত নিম্নলিখিত **'সমাধিপ্রকাশ'** গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে :—

(১) **জাতি কথা**—বর্দ্ধিত ৩য় সংস্করণ, সাহায্য—২৲। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া বহু মনীষী, সংবাদপত্র, মাসিক পত্রাদির দ্বারা উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত। বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ, ত্রিপিটক, ইতিহাস প্রভৃতি বহু গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বাক্যে স্বীয় মত সমর্থিত। ছয় বৎসরে দুই সংস্করণ নিঃশেষিত। ৩য় সংস্করণ বর্দ্ধিত কলেবরে বহু নূতন তথ্যে। "The pamphlet is a feat which would have done honour to a Ph. D. of any university of the world."

(২) **শুদ্ধামাধুরী**—বর্দ্ধিত ৩য় সংস্করণ, সাহায্য—৮০। কৃষ্ণলীলা, গৌরাঙ্গ লীলা, জগদ্বন্ধুলীলার ও অরূপ লীলার মাধুর্য্যরসে ভাব রাগ ভরা। ভাব ও ভাষা কবিত্বময়! আঙ্গিনা পত্রিকায় প্রকাশিত। উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত।

(৩) **পরশমণি**—বর্দ্ধিত ৩য় সংস্করণ, সাহায্য—॥৵০। সমাজের অবিচার, অত্যাচার পোড়াইয়া বর্ণলৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিবার প্রাণদ মন্ত্র গল্পচ্ছলে লেখা। উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত।

(৪) **বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা**—২য় সংস্করণ ২৲ সাহায্য। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হাই স্কুলের লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত (Calcutta Gazette, 29th July, 1937)। ছাত্র ছাত্রীদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির উপায় লিখিত গ্রন্থকারের পনর বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা হইতে। উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের অর্থ সাহায্যে ১ম সং প্রকাশিত।

(৫) **Gandhi-Samadhi Correspondence** (ইং)—সাহায্য —৷৵৹। নিখিল মানবের ব্রাহ্মণকরণের শাস্ত্র, ইতিহাস ; যুক্তির চুম্বক। স্পষ্ট উত্তর দানে গান্ধীজীর পরাঙ্মুখতা ও হরিজন সেবক সঙ্ঘের সঙ্কীর্ণতা খণ্ডন। 'এ্যাড্‌ভান্সে' (July 9, 1935) ও 'হিন্দু রিভিউ'তে ((Nov, 1935) প্রকাশিত। ডাঃ বি. এস. মুঞ্জের উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা।

(৬) **গান্ধী-সমাধি পত্রাবলী**—(ঐ বঙ্গানুবাদ) সাহায্য—৷৹। ইংরেজী অপেক্ষা বর্দ্ধিত ভূমিকা ও পরিশিষ্ট সম্বলিত।

(৭) **শ্রীশ্রীজগবন্ধু দর্শন**—সাহায্য ১৷৹। পুরীধাম শ্রীজগন্নাথাদি দর্শনের অভিনব ও সরস ভ্রমণ কাহিনী। ভাব ও ভাষা কবিত্বময় ; মরমী ভক্তজনের আস্বাদ্য। উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত।

(৮) **ব্রহ্মচক্র**—১৲

(৯) **পল্লীবোধনে অন্নসমস্যা**—১৷৹

(১০) **হিন্দুসংগঠনে**—১৷৹

আরও নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে :—

(১) **বুদ্ধের আভাষ** (২) **পল্লী বোধন** (৩) **বিদ্যা—শিক্ষা ও সাধনা** (৪) **পুরুষ বা আত্মা—শূন্য, এক বা বহু** (৫) **বর্ণবাদ** (৬) **Swarajya cum Truth** (৭) **Synthetical Ideolgy of Hindu cults** (৯ই ডিসেম্বর ১৯৩৭, কলিকাতায় প্রথম ধর্ম্মসম্মেলনে হিন্দুধর্ম্ম শাখায় পঠিত।) (৮) **Yoga or Nirvana**। [নিখিল ভারত বিজ্ঞান সম্মেলনে হায়দারাবাদে (জানুয়ারী, ১৯৩৭) ও কলিকাতায় (জানুয়ারী, ১৯৩৮) অধিকাংশ পঠিত ও 'Indian Journal of Psychology'তে (July, 1938) প্রকাশিত। (৯) **Glimpses of the Buddha** (ইং) কলিকাতায় ১ম ধর্ম্মসম্মেলনীতে (ডিসেম্বর, ১৯৩৭) বৌদ্ধধর্ম্মশাখায় কিয়দংশ পঠিত। (১০) **আর্যহিন্দু**

সঙ্ঘগঠন (১১) সাম্যবাদ—রুশীয় ও ভারতীয় (১২) মুক্তিসন্ধান (উপন্যাস) (১৩) কোরবানীর কথা (১৪) গুরুতত্ত্ব—দীক্ষা ও সাধনা (১৫) প্রণবে সাধনা (১৬) ভারতের অঙ্গচ্ছেদ (১৭) **Aryanisation or Hinduisation** ইত্যাদি।

প্রাপ্তিস্থান :—সম্পাদক আর্য্যসঙ্ঘ, (১) সমাধিনগর পোঃ জেলা ফরিদপুর। অথবা (২) পোঃ কাশিমপুর, জেঃ রাজসাহী অথবা (৩) 'সমাধি আশ্রম,' পোঃ রাজবাড়ী (ফরিদপুর)। অথব (৪) ~~১২৬, সীতানাথ বসু~~ লেন, পোঃ সালিখা (Salkia) জেঃ হাওড়া। অথবা (৫) **City Draggists,** মেটা বিল্ডিং। ৫৫।১১০, ক্যানিং ষ্ট্রী কলিকাতা।

হিন্দু সংগঠনে 'আর্য্য-সঙ্ঘ'

আপনি হিন্দু, হিন্দুকে রক্ষা করুন

সহস্র সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও ধর্ম্মনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতে আর্য্য হিন্দুর যে অঙ্গচ্ছেদ ও অবনতি হইয়াছে তাহার বিষয় একবার চিন্তা করুন। আজ হিন্দুস্থানে হিন্দুর নাম বিলুপ্ত-প্রায়, শ্রেণী-বিভাগে হিন্দু আজ 'অমুসলমান'' শ্রেণীতে পরিণত। আর্য্য-হিন্দু নানাভাবে নানাদিক হইতে আক্রান্ত। তবু এখনও তাহারা আত্মরক্ষায় সচেতন হইল না? এখনও তাহারা মোহনিদ্রায় মগ্ন, ঐক্য সংগঠনে উদাসীন!

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, মহাসাধক আচার্য্য **শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য মহারাজ** (বিনোদপুর ও বালিয়াকান্দ হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়)

আজ হিন্দুকে এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে উপস্থিত দেখিয়া হিন্দু-সংগঠনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি কয়েক জন ত্যাগী কর্ম্মীর সহযোগে ফরিদপুর জেলায় কামারখালী ষ্টেশনের সন্নিকটে সমাধি-নগর নামক স্থানে **'আর্য্য-সঙ্ঘ'** নামে একটী আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি দরিদ্র হিন্দু (নমঃশূদ্র) কৃষকদের নিকট হইতে ১৬।১৭ বিঘা জমি দানস্বরূপ পাইয়াছেন। হিন্দুর তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়কে বাদ দিলে বৃহত্তম অংশটীই বাদ পড়িয়া যায়, হিন্দু তাহা হইলে বাঁচিতে পারেনা। তাই তিনি সকল বৈষম্য দূর করিয়া হিন্দুর নিপীড়িত বিরাট অংশকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া হিন্দু-সংগঠনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন।

এই উদ্দেশ্যে ব্রতী হইয়া তাঁহারা একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া পল্লীবাসীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফরিদপুর জেলা বোর্ডের সৌজন্যে দুইটী নলকূপ বসাইয়া পল্লীবাসীর পানীয় জলের অভাব কথঞ্চিৎ দূর করিয়াছেন। শিক্ষা প্রচারের জন্য একটী মধ্য (অধুনা উচ্চ) ইংরাজি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু উপযুক্ত অর্থাভাবে তাঁহাদের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণতি ও প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না। যে সমস্ত ত্যাগী কর্ম্মী এই সব মহান্ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের বাসোপযোগী কয়েকখানি ঘরের এবং চিকিৎসালয়ের (ও বিদ্যালয়ের) ঘরের অভাব অত্যন্ত। আমরা তাঁহার কর্ম্মধারার সঙ্গে সুপরিচিত হইয়া সহৃদয় হিন্দু নরনারীগণকে হিন্দুর এই জাতীয় দুর্দ্দিনে হিন্দু-সংগঠন কার্য্যে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহার রচিত **'জাতি কথা'** প্রভৃতি গ্রন্থমালা গ্রহণ করিলেও হিন্দু-সংগঠন কার্য্যে সহায়তা করা হইবে। ইতি—৬ই মাঘ, ১৩৪৫ সাল।

বিনীত নিবেদকগণ :—

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট)।

শ্রী রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (প্রাদেশিক হিন্দুসভার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট)। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) শ্রীমৃণাল কান্তি ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকা)। শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ (সম্পাদক, দৈনিক বসুমতী)। শ্রীহরিদাস মজুমদার (অমৃত সমাজ)। শ্রীসরসীলাল সরকার (অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্জন)। শ্রীবিশ্বেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, হরিপুর রাজর্ষি ভবন (দিনাজপুর)। শ্রীঅনঙ্গমোহন লাহিড়ী (অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট জজ)। শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (ইন্‌করপোরেটেড্ অ্যাকাউন্টেন্ট)। শ্রীকেশব চন্দ্র লাহিড়ী, প্রতিষ্ঠাতা, জীব-শিব-মিশন। শ্রীমহেন্দ্রকুমার সাহা চৌধুরী (রাজসাহী)। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, শীতলাই (পাবনা)। শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত (বেদান্তরত্ন)। শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্সেলার)। শ্রীসনৎ কুমার রায় চৌধুরী (কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র)। শ্রীমাখন লাল সেন (আনন্দবাজার পত্রিকা)। শ্রীঅমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজ। শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ, অধ্যক্ষ শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ। প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী, সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভা। শ্রীপ্রফুল্ল কুমার সরকার (আনন্দবাজার পত্রিকা)। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মৈত্র (ভাইস প্রেসিডেন্ট, ফরিদপুর সেবা-সমিতি)। শ্রীকিশোরী মোহন চৌধুরী (রাজসাহী)। স্বামী সত্যানন্দ (সভাপতি, হিন্দু মিশন)। শ্রীভাই পরমানন্দ (সহকারী সভাপতি, নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভা) লাহোর। এস. এন. দাসগুপ্ত (প্রফেসার ইমেরিটাস, ফর্ম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজ), লাহোর। শ্রীমেহের চাঁদ খান্না (রায় বাহাদুর, এম. এল. এ.) পেশোয়ার। মিঃ কে. পি. সাহা এম, এস-সি, এম, বি।

অর্থাদি পাঠাইবার ঠিকানা ঃ—

(১) সম্পাদক—**'আর্য্য সঙ্ঘ'** (ফরিদপুর)
পোঃ ও গ্রাম—সমাধিনগর অথবা
(২) **শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,**
৩৬এ, রসা রোড, পোঃ কালঘাট, কলিকাতা

শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য মহারাজের লিখিত পুস্তকাবলী :—(১) **জাতি কথা**—২৲ টাকা (২) **পরশমণি**—৷৶০ আনা, (৩) **শুদ্ধামাধুরী**—৸০ আনা, (৪) **বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা**—২৲ টাকা (৫) **Ghandhi-Samadhi correspondence** (ইংরাজি)—৷৶০ (৬) **গান্ধীসমাধি পত্রাবলী** (ঐ বাংলা)—৷০ আনা। (৭) **শ্রীশ্রীজগবন্ধু দর্শন**—১৷০ (৮) **ব্রহ্মচক্র**—১৲ (৯) **পল্লীবোধনে অন্নসমস্যা**—১৷০ (১০) **হিন্দুসংগঠনে**—১৷০ প্রাপ্তিস্থান : (১) সম্পাদক, আর্য্য-সঙ্ঘ, পোঃ—সমাধিনগর (ফরিদপুর) অথবা (২) পোঃ কাশিমপুর (রাজসাহী) অথবা : (৩) সমাধি-আশ্রম, পোঃ রাজবাড়ী (ফরিদপুর)। অথবা (৪) ১২৬, ৫০ ভৈরব দত্ত লেন, পোঃ সালিখা (Salkia), জেঃ হাওড়া।
